

এডওয়ার্ড কলেজের স্মৃতিময় দিনগুলো

৪ ❖ পৃষ্ঠা

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

sompriti.pabna@gmail.com

www.sompritibangladesh.com



সম্প্রীতি বাংলাদেশ প্রকাশিত হয় প্রতি মাসের ১৪ তারিখ

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ১২ ● ২৯ কার্তিক ১৪৩৩ ● ঢাকা শনিবার ● ১৪ নভেম্বর ২০২৬ ● ৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি ● পৃষ্ঠা ৮ ● ১০ টাকা



এবার 'উষ্ণ শীতে'র আয়ু হবে কম

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

মৌসুমি বায়ু বিদায় নেওয়ার পর থেকেই আবহাওয়ায় শুরু হয়েছে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব। গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গায়ই এরইমধ্যে শীত নেমে পড়েছে। কুয়াশায়ও ডুবছে প্রকৃতি। রাতে শহরেও শীত অনুভূত হচ্ছে। শীত নিয়ে বিশেষজ্ঞরা এবার নেতিবাচক বার্তা দিচ্ছেন। বলছেন, এবারের শীত হবে উষ্ণ, কমবে শীতকালের ব্যাপ্তিও। অর্থাৎ আগেরমতো শীতের আয়ু বেশি সময় পর্যন্ত হবে না। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বিদায়ের পর দেশে বর্ষা থেকে শীতের দিকে যাওয়ার প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়েছে। সে কারণে গতমাস থেকেই গ্রামাঞ্চলে ভোরের কুয়াশা, শিশিরভেজা ঘাস আর বাতাসে হালকা শীতলতা সেই পরিবর্তনের জানান দিয়েছে। তবে এখনও তীব্র শীতের পূর্বাভাস ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই। আগামী দিনগুলোতে রাতের তাপমাত্রা, কুয়াশার বিস্তার এবং বাতাসের গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করবে শীতের অনুভূতি কতটা বাড়বে। আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

আসছে রূপপুরের বিদ্যুৎ

■ আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শীঘ্রই জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম পারমাণবিক প্রকল্প থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ। এরইমধ্যে প্রায় সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি গত ৩০ অক্টোবর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। এ অবস্থায় দেশের সর্ববৃহৎ প্রকল্পটি এখন উৎপাদন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এছাড়া গত ৩১ অক্টোবর ও ৬ নভেম্বর প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য রাশিয়া থেকে আরও দুটি ইউরেনিয়াম জ্বালানির চালানও চলে এসেছে। রূপপুর সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, চলতি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জাতীয় গ্রিডে প্রথম ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হতে পারে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে অন্তত ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পরীক্ষামূলকভাবে এ বছরই জাতীয়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বিশেষ ভূমিকায় দুই বড় সোলার পার্ক

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা জেলার দুটি বড় সোলার পার্ক থেকে উৎপাদিত গ্রিন এনার্জি সরাসরি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে, যা দেশের সামগ্রিক ঘাটতি পূরণে বড় অবদান রাখছে। এ পার্ক দুটির একটি হলো সদরের (চর ভবানীপুর) পদ্মা নদীর বিশাল চরে থাকা ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সোলার পার্ক। আরেকটি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪





আশার আলো বিদ্যুতে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদী এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ২০ শতাংশ (১০ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে) বিদ্যুৎ উৎপাদন; সরকারি ভবন, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সোলার

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

চলছে নতুন প্রকল্প ও কেন্দ্র বৃদ্ধির কাজ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনায় বর্তমানে তেল (ফার্নেস অয়েল বা এইচএফও) চালিত বিদ্যুতকেন্দ্র রয়েছে বেড়া উপজেলার বৃশালিখায়। এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ৭০ মেগাওয়াট। এরকম আরও কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঈশ্বরদীতে নতুন সোলার প্রকল্পের কাজও চলমান। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানাচ্ছে, পদ্মার চরাঞ্চলে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪





চলনবিলে ফাঁদ

পাখি আসছে দলে দলে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চলনবিলে পারিযায়ী-অপারিযায়ী মিলিয়ে সব ধরণের পাখির দল সমবেত হতে শুরু করেছে। এরইমধ্যে এই বিলে দেখা মিলছে সাদাবক, পানকৌড়ি, শামুকখোল, বালিহাঁসসহ নানা প্রজাতির পাখির। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মৌসুমে খাবার, আশ্রয় ও অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে বহু পাখি হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসে।

স্থানীয় সূত্রগুলোর খবর অনুযায়ী, পাখির কলকাকলিতে চলনবিল মুখর হয়ে উঠলেও উদ্বেগ বেড়েছে শিকারীদের নিয়ে। তাদের ফাঁদে ধরা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে এসব পাখি। প্রতিবারের মতো এবারও খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে বা আরও নানা কৌশলে পাখি শিকারের ঘটনা জলাভূমির জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। স্থানীয়দের ভাষ্য, চলনবিলে ঝাঁকে ঝাঁকে বকসহ বিভিন্ন অতিথি পাখি আসে। বিল, জলাশয় ও গাছকে আশ্রয় করে এসব পাখি বিচরণ করলেও শিকারিদের নানা কৌশলের কারণে নিরাপদে থাকতে পারছে না। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলনবিলের ধানক্ষেত

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ'

■ শুচি সৈয়দ

দেখতে দেখতে তিনটি বছর পেরিয়ে **'সম্প্রীতি বাংলাদেশ'** চার বছরে পা রাখছে। বিষয়টি একটি পত্রিকার জন্য গৌরবের। বাংলাদেশ শ্বাশত সম্প্রীতির দেশ– সেই দেশে আমরা নতুন করে 'সম্প্রীতি'র কথা উল্লেখ করছি তার অর্থ কী? এদেশে কি মানুষে মানুষে সম্প্রীতি'র অভাব ঘটেছে, সম্প্রীতি উধাও হয়ে গেছে? তেমনটি নয়, তবে 'সম্প্রীতি' চর্চার অভাব দেখা দিয়েছে। অভাব ঘটেছে পারস্পরিক যোগাযোগের, সাহচার্যের, বিনিময়ের। আমরা নিজেদের জীবন নিয়ে, পেশাগত দায়িত্ব পালনে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে নিজেদের দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত হারিয়ে ফেলছি। সত্যি সত্যি 'বিজ্ঞানের বেগ আমাদের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পানিসম্পদ মন্ত্রীর ঘোষণা

বছরের শুরুতেই পদ্মা ব্যারেজের কাজ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

২০২৭ সালের শুরুতেই (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে) বহুল প্রত্যাশিত পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।

গত ২৫ অক্টোবর তিনি পাবনার সুজানগর উপজেলার সাতবারিয়ায় পদ্মা ব্যারেজের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও কারিগরি টিমের সঙ্গে আলোচনা শেষে এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বিগত ২০০৪ সালেই বিএনপি সরকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সরকারের রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে এই প্রকল্প আলোর মুখ দেখেনি।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

DCH TRUST

মাটি ও মানুষের সংগ্রামে সম্প্রীতি বাংলাদেশ কে শুভেচ্ছা

DCH TRUST

DCH TRUST

Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST

190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217

এস.বি ০০০/৬৪

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ



১৯তম কাউন্সিলে নতুন কমিটি

লড়াই-সংগ্রামে গণশিল্পী পাবনার ৪৩ বছর

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

‘শিল্প সংস্কৃতি সংগ্রাম, আমাদের যুদ্ধ অবিরাম’ স্লোগানকে ধারণ করে লড়াই-সংগ্রামে ৪৩ বছর পার করেছে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, পাবনা। গত ২ অক্টোবর ১৯তম কাউন্সিল অধিবেশনের মধ্যদিয়ে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিকালে পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনের এ কাউন্সিলে ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের জন্য অধ্যাপক শিবজিত নাগকে সভাপতি ও সাইফুল ইসলাম সীমান্তকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যদিয়ে এই কাউন্সিলের উদ্বোধন করা হয়। এরপর বিগত মেয়াদে প্রয়াত সহযোদ্ধা ও বিশিষ্টজনদের স্মরণে শোক প্রস্তাব উত্থাপন এবং ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে সংগঠনের গত মেয়াদের সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সীমান্ত। উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশ নেন এবং মতামত প্রদান করেন সদস্য ও সহযোদ্ধারা। এসময় বক্তব্য দেন বিপ্লব ভৌমিক, আল্ আমিন লিমন, আবদুল্লাহ আল মাসুদ, নুসরাত জাহান স্বর্ণা, আনিসুর রহমান, অঞ্জলি ভৌমিক, ছিফাত রহমান সনম, সাগর আলি, নিপা ইসলাম, মাহবুবুল আলম লিটন, নাহিদুজ্জামান নাহিদ, ভাস্কর চৌধুরী, উজ্জ্বল সাহা, আঁখিনুর ইসলাম রেমন ও ডা. রামদুলাল ভৌমিক। প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও প্রস্তাব সংযোজনের পর সর্বসম্মতিক্রমে সাংগঠনিক প্রতিবেদন গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিদায়ী কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন করা হয়।

ঘোষিত ২০২৬- ২০২৮ মেয়াদের নতুন কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত অন্যান্যরা হলেন সহ-সভাপতি ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, এডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, উজ্জ্বল কুমার সাহা, আঁখিনুর ইসলাম রেমন, মাহবুবুল আলম লিটন ও ছিফাত রহমান সনম। অন্যান্যর মধ্যে নির্বাচিত হন সহ-সাধারণ সম্পাদক আল আমিন হোসেন লিমন, সাংগঠনিক সম্পাদক রাকিবুজ্জামান শাদ, অর্থ সম্পাদক মীর ফজলুল করিম বাচ্চু, শিল্পকলা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক নমিতা রায়, প্রচার সম্পাদক নুসরাত জাহান স্বর্ণা, দপ্তর ও যোগাযোগ সম্পাদক শারমিন আক্তার মিতা। কার্যকরী সদস্যরা হলেন বিপ্লব ভৌমিক, ভাস্কর চৌধুরী, আখতারুজ্জামান আখতার, তিমির হায়দার, আনিছুর রহমান, শ্যামলী দাস, রওশন আক্তার মিণ্টু, আবদুল আওয়াল, আবদুল্লাহ আল মাসুদ, অঞ্জলী সেন, হাবলু অধিকারী, নাহিদুজ্জামান নাহিদ, শুকদেব কর্মকার, পলাশ চন্দ্র মালাকার, উত্তম বিশ্বাস, মোস্তফা কামাল, শ্যামলী সরকার, কাজল লতা, এডভোকেট ইতি হোসেন স্বপ্না, নুরুল ইসলাম, বিদ্যুৎ সাহা দিপু, ফজলুল হক সুমন, কবির হোসেন, ইলোরা লেয়া, ফরহাদ হোসেন, বেলাল হোসেন, নিপা ইসলাম, আতিয়া সুলতানা আশা ও উল্লাস সাহা। কাউন্সিল অধিবেশন শেষে আমন্ত্রিত শিল্পী ও সংস্থার সংস্কৃতিকর্মীদের অংশগ্রহণে গণসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী নমিতা রায়, অঞ্জলী সেন, শারমিন আক্তার মিতা, নুসরাত জাহান স্বর্ণা, শ্যামলী দাস, আতিয়া সুলতানা আশা, নিপা ইসলাম, আল আমিন হোসেন লিমন, দিপ্রতা এবং আনিছুর রহমান। যন্ত্রশিল্পী ছিলেন হাবলু অধিকারী, উত্তম বিশ্বাস, ফরহাদ হোসেন, নাহিদুজ্জামান নাহিদ।

‘যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : প্রজন্মের মানুষের আবেগকে কেড়ে নিয়েছে।’ শুধু আবেগ কেড়ে নিয়েই থেমে যায়নি, সে আমাদেরকে কেড়ে নিয়েছে আমাদের নিজের অস্তিত্বের কাছ থেকেও। ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ সেই আবেগটার ওপর আলো ফেলে জাগিয়ে দেবার প্রয়াস, নিজেকে নিজেদের কাছে ফিরিয়ে দেবার আয়না।

২.

অক্টোবরের ১৫ তারিখে আমি ধানমন্ডি গেলাম, দেশের বরেণ্য চিন্তাবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। স্যার কিছুটা অসুস্থ সে জন্য তাঁকে দেখতে যাওয়া। পরিকল্পনা ছিল আমি, এস.এম গোর্কি, মীর মোস্তাফিজুর রহমান চঞ্চল ও ডা. এহসানুল হক, আনিস রহমান– প্রমুখ তাঁকে দেখতে যাবার। এদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সময়ে এমন আলাপ ও সম্মতি নিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সবার সঙ্গে সময়কে মেলাতে ব্যর্থ হয়ে শেষে স্বার্থপরের মতো আমি একাই গেলাম। বেশ অনেকটা সময় স্যারের সঙ্গে আমার কথা হলো। স্যারের বাসা থেকে আসার সময় তিনি তাঁর লেখা ‘বিচ্ছিন্নতায় অসম্মতি’ বইটি দিলেন নিচের এই কথাগুলো লিখে–

‘শুচি সৈয়দকে স্বর্ণযুগের স্মৃতিতে–সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ১৫.১২.২০২৬’

আমি বলা চলে অজস্র কথার ভিড়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম এই এক বাক্যের শব্দাবলীর কাছে। কেন? স্যার এই ছোট্ট বাক্যটিতে স্মরণ করেছেন–সাপ্তাহিক সময়-এর দুই বছরকে–‘স্বর্ণযুগ’ বলে। অর্থাৎ, বারো বছর! আমার জীবনে স্যারের সান্নিধ্যে কাটানো ওই দুই বছরের লেংথ ‘জীবনব্যাপী’! এমনটিই ঘটে। মানুষ যখন তার প্রিয় কাজে, প্রিয় ও প্রার্থনীয় মানুষের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করে তখন তার প্রকৃত আয়ু দীর্ঘ হয়ে যায়। একটা মুহূর্ত পরিণত হয় বছরে, একটা বছর পরিণত হয় একটা যুগে। এ অভিজ্ঞতা শুধু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যারের একার নয়। এ অভিজ্ঞতা প্রতিটি মানুষের জীবনের সত্য। এই সত্য আমরা উপলব্ধি করি যখন সত্যি সত্যি নিজের সামনে দাঁড়াই কেবল তখন।

‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’-এর শেষ সংখ্যায় স্যারকে নিয়ে আমার একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। সেটি পড়ে স্যার দুপুরের পর ফোন করে জানালেন, লেখাটি তাঁর ভাল লেগেছে। লেখাটি ছিল সেই সাপ্তাহিক সময় পত্রিকার ‘স্বর্ণযুগ’কে নিয়েই। সঙ্গে স্যারের আজীবন অনাড়ম্বর জীবন-এর বর্ণনাও। মজার ব্যাপার হচ্ছে ‘সময়’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে স্বর্ণযুগে’র অনুভূতি তা আমার লেখায় মোটেই স্পষ্ট নয়, যতটা সুন্দর ভাবে স্যার একটি শব্দে তা তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি তিনি তো আমার লেখাটিও পড়েছেন পরে।

৩.

‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’-এর চতুর্থ বর্ষে পদাপর্ণের এইক্ষণে আমার সাপ্তাহিক ‘সময়’ পত্রিকার কথা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সাপ্তাহিক ‘বিবৃতি’র কথা। সাপ্তাহিক ‘সময়’ যেমন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যারের কাছে, আমার কাছে একই অনুভূতির অনুভব তেমনই ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’, সাপ্তাহিক ‘বিবৃতি’ আমাদের শহরের প্রমিথিউস অধ্যাপক শিবজিত নাগ এবং আবুল হোসেন খোকন, ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’-এর সম্পাদকীয় কলামের পাশে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের সবার কাছে, আমার কাছে, আমাদের পাবনা শহরের প্রতিটি সচেতন মানুষের কাছে সমান মর্যাদার অনুভূতি। তার একটি ছিন্ন উদ্ধৃতি দিই। আমার পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত বই ‘কালাকালের কড়চা’র নতুন উৎসর্গের পাতা থেকে–

‘‘অধ্যাপক শিবজিত নাগ, শ্রদ্ধাস্পদেষু

দাদা,

আমাদের একটি স্বপ্ন ছিল, আমাদের একটি সংগ্রাম ছিল–সাপ্তাহিক ‘বিবৃতি’ তার নাম। জেলা শহর পাবনা থেকে প্রকাশিত প্রতি বিষ্যুদবারের সেই ৪ পৃষ্ঠার নিউজপ্রিন্টে ছাপা ট্যাবলয়েডের সাদাকালো পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে আমাদের অনেক জয়পরাজয়, আনন্দ-বেদনার ইতিহাস।

আমরা লড়েছি মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসাকে একমাত্র আয়ুধ জেনে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসায়–মানুষ কি অপরিসীম দীপ্যমান হয়ে ওঠে–আমার কাছে আপনি তার উদাহরণ। তাই এই বইটি আপনাকে উৎসর্গ করার অর্থ নিজেদেরকেই উৎসর্গ করা।

সাপ্তাহিক বিবৃতির স্মরণীয় সতীর্থ– প্রকাশক ইয়াসিন আলী মৃধা রতন, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত শ. ই শিবলী, অধ্যাপক আবু মহম্মদ রইস, অধ্যাপক আতাহার আলী খান, অকাল প্রয়াত কবি জাহাঙ্গীর-উল হক, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, প্রয়াত মুকুল আহমেদ, শ্যামল দত্ত, অকাল প্রয়াত কৃষিবিদ ড. সমজিৎ পাল, অকাল প্রয়াত কথাশিল্পী ফয়জুল ইসলাম সুমন, অকাল প্রয়াত অমল সরকার, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, মহম্মদ রাশেদ, আবুল হোসেন খোকন, অঞ্জন রায়, জুলফিকার সেলিম, বিবৃতি কর্মী জয়নাল আবেদীন, আবদুল মজিদ, বদরউদ্দিন, জুলফিকার, হরিকাকা, দেবপ্রসাদ কাকার কথাও।

এঁদের কারো অর্থ, কারো ঘাম, কারো রক্ত, কারো শ্রম–এই সব মিলিয়ে প্রবাহিত এক ভালোবাসা-সংগ্রামের নামই ছিল–সাপ্তাহিক ‘বিবৃতি’।

এখনও হঠাৎ স্মৃতির জানালা হাট করে খুলে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই হিরণ্ময় দিনগুলি–আমার প্রথম এবং একমাত্র প্রেম; আমাদের সব্বারই কি? হয়তোবা, হয়তোবা নয়–

মানুষকে ভালোবাসার চেয়ে ভালো আর কিছুই পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীতে আজো আলো আছে, আজো আশা আছে আপনার মতো কিছু স্বপ্নবান প্রমিথিউস আছেন বলেই।’’

[শুচি সৈয়দের ‘কালাকালের কড়চা’র নতুন উৎসর্গের পাতা থেকে। ১৯৯১-এ প্রকাশিত, পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত]

‘বিবৃতি’ ছিল আমাদের স্বপ্নসহযাত্রী, ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ আমাদের স্বপ্নসহোদর। পাবনা শহরে এক সময় কোনো নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হতো না, ছিল না পেশাদার সাসটেইনেবল পত্রিকা। অর্থাৎ নিজের আয়ে নিজে চলার মতো পত্রিকা পাবনায় প্রথম সাপ্তাহিক বিবৃতি। যার সঙ্গে যুক্ত ছিল সে সময়ের তারুণ্যের শক্তি। সেই একই ধারায় ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ বর্তমান প্রজন্মের তারুণ্য ও স্বপ্নবান প্রমিথিউসদের একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ করে সারা দেশে, বিশ্বব্যাপী ‘সম্প্রীতি’র পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে সবার অংশগ্রহণ, সবার সম্মিলিত শুভকর্মকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়।

৪.

‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’-এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ থাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের সম্পূর্ণ কথামালা। তাঁর কথামালা থেকে– ‘যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ’– এই পংক্তিটিকে আমরা ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’-এর শ্লোগান হিসেবে নির্বাচিত করেছি আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করতে। পুরো গানটি হচ্ছে–

‘‘অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো হে
সুন্দর করো হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয়
করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ;
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত
করো হে,
নন্দিত করো নন্দিত করো
নন্দিত করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।’’

রবীন্দ্রনাথের এই গানের বাণীতে এক বাঙালি কবির সমগ্র ধরিত্রী এবং তার সমস্ত স্পন্দনমান জীবনের ঐক্যস্পন্দনের সুর বিধৃত হয়েছে। তাঁর এই শাশত সুর ভবিষ্যতের স্বপ্নমথিত, বর্তমানের প্রাণস্পন্দিত। আমরা বর্তমান প্রজন্মের বুকের তারে এই সুরটি সঞ্চারিত করে দিতে চাই ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’-এর প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি শব্দে, অক্ষরে। আমরা এই প্রজন্মের বুকে তাঁর বাণী– ‘সঞ্চার করো সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ’– এই ধ্যানস্থ শান্তির কথা চারিয়ে দিতে চাই। মানুষ এবং তার সর্বজনীন কল্যাণের চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু নেই। এই কাজে আমরা আমাদের সঙ্গে সবাইকে পাশে চাই–আমরা চাই সম্প্রীতির এক অবিচ্ছিন্ন বিশ্ব।

আসছে রূপুরের বিদ্যুৎ

প্রথম পৃষ্ঠার পর : গ্রিডে সরবরাহ শুরু হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানান, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামি বছরের মাঝামাঝিতে বাণিজ্যিকভাবে এ ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে গত ২৯ অক্টোবর নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (বায়রা) আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের মাধ্যমে ৩০ অক্টোবর থেকে রূপপুরের প্রথম ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করে। এটি ছিল পরীক্ষামূলক উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় বা ‘সি’ স্টেজ। এর মধ্যদিয়েই রূপপুরের প্রথম ইউনিট পাওয়ার স্টার্টআপ বা বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর ধাপে প্রবেশ করে। তারও আগে ‘বি’ স্টেজে গত ১১ অক্টোবর রূপপুরের প্রথম ইউনিটে নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া শুরু করা হয়। এ প্রসঙ্গে বায়রার চেয়ারম্যান মো. মাহমুদুল হাসান সম্প্রীতি বাংলাদেশকে বলেন, বি-২ ধাপের ফিজিক্স টেস্ট (বিক্রিয়া) সন্তোষজনক ফলাফলের পর আমরা ইউনিট-১ কে পাওয়ার স্টার্টআপ চালুর জন্য ‘সি’ স্টেজে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছি।

‘সি’ স্টেজে যেভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে : প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, ‘সি’ স্টেজে রিঅ্যাক্টরের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে বাষ্প বা স্টিম তৈরি করা হবে, যা টারবাইন চালিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। এই ধাপে উৎপাদনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে এবং টারবাইনের কার্যকারিতা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হবে। সম্পূর্ণ নিরাপদ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পুরো প্রক্রিয়াটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে বায়রা। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জাহেদুল হাসান জানান, পাওয়ার স্টার্টআপ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউনিট-১ একটি সুশৃঙ্খল অপারেশনাল টেস্টিং কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো, নিয়মিত বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে প্লান্টের নিরাপদ, স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করা। এই ধাপের একটি প্রধান অপারেশনাল মাইলফলক হলো, জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে জেনারেটরের সফল সিঙ্ক্রোনাইজেশন এবং স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ।

রূপপুর প্রকল্পের পটভূমি: ৬০ এর দশকে (১৯৬১ সালে) পদ্মা নদীর তীরবর্তী পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশি ইউনিয়নে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার একটি পারমাণবিক প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথম জায়গা অধিগ্রহণ করে। সে সময় এ প্রকল্পের অগ্রগতি না হলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রতিটি সরকার রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নে বারবার উদ্যোগ নিলেও আর্থিক, কারিগরি ও আন্তর্জাতিক নানা সমীকরণে তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এই প্রকল্পে দুটি ভিভিইআর-১২০০ (ভিভিইআর-১২০০) রিঅ্যাক্টর রয়েছে। উভয় ইউনিট পুরোপুরি চালু হলে এই প্লান্ট থেকে জাতীয় গ্রিডে মোট ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সব মিলিয়ে দেশের প্রথম পারমাণবিক প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন সবাই।

অবশেষে ঢাকা যাচ্ছে

শেষের পৃষ্ঠার পর চাটমোহর, বড়ালব্রিজ, উল্লাপাড়া, শহীদ মনসুর আলী, টাঙ্গাইল, জয়দেবপুর এবং ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন। এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় আগামী ১৯ নভেম্বর অপরাহ্নে সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম পাবনা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেন দু'টির উদ্বোধন করবেন।

এর আগে ২০২৩ সালের মে মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পাবনা সফরে এসে ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন চালুর ঘোষণা দিয়েছিলেন। ওই বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ট্রেন চলাচল শুরুর কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর বর্তমান সরকারের সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, পাবনা-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের ব্যাপক তৎপরতা এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলামের বিশেষ ভূমিকায় দীর্ঘদিনের এ প্রত্যাশা পূরণ হতে যাচ্ছে।

কপালী কাটার তালিকায়

শেষের পৃষ্ঠার পর : তবে বাণিজ্যিকভাবে খেজুর বাগান তৈরি না করায় আগের মত আর রস, গুড় উৎপাদন হয় না। এখানে আসল পাটালী গুড়ের কদর বেশী। শীত মৌসুমে যে রস, গুড় ও পাটালি তৈরি হয়, তা নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি শুরু হয়। অসাধু ব্যক্তিরা চিনি ও ফিটকিরি মিশ্রিত গুড় বাজারজাত করে থাকেন।

বিশেষ ভূমিকায় দুই বড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর : সুজানগরে (সাগরকান্দি) ২০৪ একর জমির উপর বাংলাদেশ-চীন যৌথ উদ্যোগে নির্মিত সোলার পার্ক। এটি থেকে ৬৪.৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। বছরে এটি প্রায় ১১ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিষ্কার বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জেলার নিজস্ব সর্বোচ্চ দৈনিক চাহিদা যেখানে মাত্র ৭৯ মেগাওয়াটের কাছাকাছি, সেখানে এই দুই সোলার থেকে মোট চাহিদার দ্বিগুণেরও বেশি (১৬৪ মেগাওয়াট) পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করছে। এর ফলে দিনের বেলার পিক-আওয়ারের লোডশেডিং কিছুটা হ্রাস করানো সম্ভব হচ্ছে। সূত্র জানায়, সৌরবিদ্যুৎ মূলত দিনের বেলা (সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত) উৎপাদিত হয়। দিনের বেলা যখন তাপদাহ বা সেচ কাজের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যায়, তখন এই সোলার পার্কগুলোর কারণে বিদ্যুৎ বিভাগ বাড়তি ব্যাকআপ পাচ্ছে।

তবে সোলার পার্কের সঙ্গে যুক্তদের ভাষ্য থেকে ধারণা পাওয়া গেছে, বর্তমানে দেশের প্রধান বিদ্যুতকেন্দ্রগুলো গ্যাস এবং কয়লা সংকটের কারণে পুরোদমে চলতে পারছে না। কিন্তু সোলার পার্কগুলোর জন্য কোনো আমদানিকৃত গ্যাস বা কয়লার প্রয়োজন হয় না। সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ায় এটি দেশের চলমান জ্বালানি বিপর্যয় লাঘবে এবং পরিবেশের কার্বন নির্গমন কমাতে দীর্ঘমেয়াদি ভূমিকা রাখছে। সূত্র বলছে, সোলার পার্কগুলোর মূল চ্যালেঞ্জ হলো রাতের বেলা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে না পারা (যেহেতু ব্যাটারি স্টোরেজ ব্যাকআপ এখনও সীমিত আকারে আছে)। তাই রাতের বেলার পিক-আওয়ারে লোডশেডিং পুরোপুরি দূর করতে সোলার পার্কের পাশাপাশি জাতীয় গ্রিডের অন্যান্য বিদ্যুতকেন্দ্রের সমন্বয়ের প্রয়োজন হচ্ছে। সূত্র মতে, সরকারের নতুন উদ্যোগের ফলে এ ক্ষেত্রে আরও আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, জেলায় বিদ্যুতের চাহিদা এলাকা ও সময়ভেদে প্রতি ঘণ্টায় পরিবর্তিত হয়। তবে পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতাধীন এলাকাগুলোতে পিক-আওয়ারে (বিশেষ করে দুপুরে ও রাতে) বিদ্যুতের চাহিদা থাকে প্রায় ৭৯ মেগাওয়াট। অঞ্চলভেদে (যেমন শুধু ঈশ্বরদী উপজেলায়) দৈনিক চাহিদা থাকে প্রায় ২৭ থেকে ২৮ মেগাওয়াট। এই চাহিদার বিপরীতে পাবনায় গড়ে মিলছে ৫০ থেকে ৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। অনেক সময় সংকটের মাত্রা তীব্র হলে চাহিদার অর্ধেকেরও কম (যেমন ২৮ মেগাওয়াটের বিপরীতে মাত্র ১১ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যায়। ফলে প্রতিদিন গড়ে ১৫ থেকে ২৩ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুতের ঘাটতি থাকছে।

চলছে নতুন প্রকল্প ও

প্রথম পৃষ্ঠার পর : (ঈশ্বরদী) একটি সোলার পার্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যেখান থেকে উৎপাদিত পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ সরাসরি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে পাবনা পল্লী বিদুৎ সমিতি-১ বেসরকারি শফিক গ্রুপের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির আওতায় ৮৩৫ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি উন্নত রুফটপ সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে, যা স্থানীয় শিল্প ও আবাসিক অঞ্চলের লোডশেডিংয়ের চাপ কমাবে।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা–
সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্তা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফটের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.sompritibangladesh.com
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna



দেখতে দেখতে চলে গেল পূজো



ফাহিমুল ইসলাম শোভন

ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় পূজো মন্ডপ ছিল না। পার্কে বা মাঠে মন্ডপের বড় গেটের মত কৃত্রিম কিছু বানিয়ে পিছনটা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে ক্ষণস্থায়ী মন্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। এখানে গুটিকয়েক স্থায়ী মন্দিরে পূজো মন্ডপ করা হয়। এত বড় শহরে সংখ্যাটা নগণ্যই বৈকি। আমার বাসার কাছের একটা মাঠেও ক্ষণস্থায়ী একটি মন্ডপ করা হয়েছিল। তবে এই মন্ডপের চেয়ে মফস্বল শহরের সনাতন ধর্মের বনেদী বাড়ির পারিবারিক পূজোও যেন অনেক উৎসবমুখর ছিলো আজকালের ঢাকা শহরের বারোয়ারী পূজোর চেয়ে। মেট্রোপলিটন এই শহরে পূজোর সেই চিরন্তন ঘ্রাণটা পাইনি একেবারেই, কিছুতেই পাইনি শৈশবের সেই পূজোর আমেজ, সেই উৎসবময়তা।

শারদীয় দুর্গোৎসব প্রতিবছর আমাকে টেনে নিয়ে যায় আমার শৈশবে। পূজো, ঈদ, বড়দিন, এসব উৎসব আমাকে ভীষণভাবে স্মৃতিকাতর করে তোলে। পূজো মানেই ক্বদিন আমার শারদীয় স্মৃতিকাতরতা! ছেলেবেলার পাবনা শহরের পূজোর স্মৃতি এখনও আমার মাঝে এতটাই জাগ্রত যে, আমি পূজোর গন্ধ বলতে পাবনা শহরের গন্ধ বুঝি। মন্ডপে মন্ডপে গান, আরতি, পাড়ায় পাড়ায় ডালডা দিয়ে ভাজা লুচির ম ম গন্ধ, ঘি-এর ছোঁয়া পাওয়া লাবড়া, নানাপদের নাড়ু, আরও কত কী! পূজো মন্ডপ থেকে ভেসে আসা সেই গান যেন কানে বাজছে, 'আয় লো ছুটে আয় পূজোর গন্ধ এসেছে, ঢাক গুর গুর, ঢাক গুর গুর বাদ্যি বেজেছে.....।' এই গানটা বারেবারেই মনের মাঝে গুনগুনিয়ে উঠেছে। আরও নানা রকম শ্রুতিবিভ্রম হচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি যেন, 'গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি....' 'দম মারো দম....' অথবা 'ভুল গায়া সব কুছ....।' পূজোর গন্ধ ভরা এই গানগুলো সহজেই প্রকাশ করে যে, আমার শৈশব সত্তুর দশকের প্রথমার্ধে ঘোরাফেরা করা সদ্য স্বাধীন দেশের শৈশব।

আমাদের কী ভীষণ স্মৃতি জাগানিয়া সংস্কৃতি! ধর্ম যখন তার সীমানা ছাড়িয়ে সংস্কৃতিকে গাঢ়ভাবে ছুঁয়ে যায়, তখনই তো এই সার্বজনীনতা প্রচন্ড উৎসবমুখরতায় রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশের এই উৎসবময়তা তো আমাদের মজ্জাগত, বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সত্ত্বার প্রকাশ, আমাদের পরম ভালোলাগার অনুভব!

নবমী, দশমীর ঘণ্টা বাজে। সন্ধ্যা রাতে শেষবারের মত দেবী দর্শনে সবাই পূজো মন্ডপে ছুটতে শুরু করেন মফস্বলগুলোতে। আর এখানে এই মহানগরীতে (ঢাকা) আমরা তা সেভাবে বুঝতেও পারি না। আসলে মফস্বলের একটা আদুরে ঐতিহ্য আছে, ডিস্টিংক্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যার জন্য মফস্বলে অতিক্রান্ত ছেলেবেলা সবাইকে এতটা স্মৃতিকাতর করে রাখে। এর বিপরীত ভাবনাও মাঝে মাঝে কাজ করে। সেটা 'সময়'। এই 'সময়'টার জন্যই কি এখন এসব উৎসবের আবেদন কমে গেছে! তাই হয়তো পূজোর ঘ্রাণ খানিক পাই, খানিক পাই না। দিন বদলায়, মন বদলায়, এই দিন আর মনের গতিময়তায় কত কিছুই যে বদলে যায়! দিন চলে যায়, আমরা গত হয়ে যাই। কিন্তু চিরন্তন নিয়মে দেবী আসেন মর্ত্যলোকে। আমরা তো তারই প্রতীক্ষায় থাকি

একটি বছর। প্রিয় উৎসব, সেই প্রিয় কবিতা, শরতের স্মৃতিমেদুরতায় ঘুরে ঘুরে আসে ফি-বছর এমনিকরেই.....
পূজা উপলক্ষে আমার প্রিয় একটা কবিতা
'আমি যখন
- সুবীর মুখোপাধ্যায়'
আমি যখন ছোট :
পঞ্চমীর সকালে ঘুম থেকে উঠেই-
মা, কাল রাতে ঠাকুর এসেছে?
- অনেক রাতে, খুব হৈ-চৈ করে,
তুই তখন ছিলিস্ ঘুমিয়ে!
- ছুট্টে গেলাম কর্পোরেশন ইস্কুলের মাঠে,
তেরপলের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম
'মাগো', তোমার সর্বজয়া অভয়দায়িনী রুপ!
সারা শরীরে শিহরণ!
পুজোর ক'দিন বাবুদা,
সব কচিকাঁচার সাথে আমাকেও করে দিলো ভলেন্টিয়ার,
সিল্কের দুফালি রঙীন রিবন, পিন দিয়ে বুকে আটকানো।
- এই যে দাদা, দড়ি ধরবেন না-
কচি গলায় ভলেন্টিয়ারী মাতব্বরী!
আমি যখন কিশোর :
হেঁটে-হেঁটে-হেঁটে
বাগবাজার থেকে সিমলে, বন্ধুদের সাথে;
হঠাৎ বড় হয়ে-একদিনের জন্য সিগারেট খাওয়া,



জুতোর ফোস্কা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে 'সন্ধ্যশ্রী' '২২-এর পল্লী'!
যখন আমি প্রেমিক :
'তুমি আসবে ভয়েলের হলুদ শাড়ি পরে.
কপালে হলুদ ছোট্টো টিপ্,
দাঁড়াবে শ্রীরামপুর স্টেশনে,
সপ্তমীর সন্ধ্যায়, ঠিক্ সাড়ে পাঁচটায়',
ঘামতেল কপালে হলুদ টিপ, তুমি এলে!
'মানসী'-হলে, ইভীনিং শো-য়ে "শ্রীমান পৃথ্বীরাজ"
সিনেমার পর্দায় আমার চোখ,
মন, তোমার অস্তিত্ব জুড়ে!
যখন আমার সদ্যোবিয়ে :
-এই রিকশা, ঘণ্টা কতো করে?
সব ঠাকুর দ্যাখাবে কিন্তু।
জমজমে শাড়ি পরে সদ্যোপ্রসাধিতা মিষ্টি বৌ,
রিকশায় দু'জনা আঁটোসাটো,
আলোর মালা, সোডিয়ামের আলো,
বৌ-য়ের মুখে 'আলোর আল্পনা'
খুশীর ঝিলিক্।
চাইনিজ খেয়ে অ-নে-ক রাতে বাড়ী ফেরা।
আমি যখন পিতা :
-উফ্ আবার কোলে? ঐ দ্যাখো তোমার থেকেও ছোট্ট,
কেমন হাঁটছে!
এই তো বেলুন কিনলে, আবার গ্যাস বেলুন?
আচ্ছা, গণেশদাদার লাল ভুঁড়িটা দেখেছো?
কেমন গণেশদাদার পায়ের পাশ থেকে উঁকি মারছে,
ক'টা ঠাকুর দেখলে-গুনে রাখছো তো?
গুনে রাখো, গুনে রাখো।
বাড়ী ফিরে, দাদুকে বলতে হবে না!
আমি যখন মাঝ আকাশে :
পুজোর ভীড় আর ভালো লাগে না,
ভালো লাগে পুরোনো বন্ধুদের সাথে,
আড্ডায় সময় কাটাতে,
শারদীয় সংখ্যা পড়তে পড়তে, বিছানায়
গা এলিয়ে আলসেমি করে ঘুমিয়ে পড়তে।
যখন জীবন-সায়াহ্নে আমি :
নাতনির হাত ধরে ঠাকুর দেখি-
বাড়ীর কাছে পুজোপ্যান্ডেলে,
ঢাকের বাদ্যি.....আরতি.....
ধুনোর ধোঁওয়ায় আমার চোখ চিকচিক্
করে চোখ ভরে যায় জলে।
কাঁপা কাঁপা হাতদুটি জড়ো হয় বুকের মাঝখানে,
সজল চোখে জানতে চাই
-মাগো! সামনের বছর
- তুমি আবার আসবে,
আমি কী তখন.....?
কথা শেষ হয় না, গলা বুজে আসে।'



'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

২৮ বছর আগের স্মৃতি

এডওয়ার্ড কলেজের স্মৃতিময় দিনগুলো



অধ্যাপক ফখরুল ইসলাম

(গত সংখ্যার পর)

আগেই বলেছি এডওয়ার্ড কলেজের বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা সাড়ম্বরে পালিত হ'ত। সারা পাবনা শহরের লোকজন সেদিন কলেজে ভেঙে পড়তো। কলেজ স্পোর্টস মানেই আনসার ভাই ও শামসুল হুদা ভাইয়ের 'শো'। আমরা শিক্ষকরা ছিলাম এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষকদের জন্য ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা থাকতোই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি এক নাগাড়ে ১০/১২ বছর এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'তাম। পরে গোলাম রসুল, মুজিব ভূঁইয়া অর্থনীতি বিভাগে যোগদান করার ফলে আমার কপাল পুড়লো। তখন আমার বয়সও বেড়ে গেছে। আমার স্থান তৃতীয়তে এসে দাঁড়ালো। মুজিব প্রথম, রসুল দ্বিতীয়, আর আমি তৃতীয়। সবাই অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক। ফি বছর শিক্ষকদের ইনডোর গেম্‌স প্রতিযোগিতা হ'ত। ব্রিজ কন্ট্রাক্ট, ব্রিজ অকশন, ক্যারম দ্বৈত ও টেবিল টেনিসে ঘুরেফিরে আমার পুরস্কার থাকতই বলা চলে। টেবিল টেনিসে ওয়াহাব খানের ১ম ও আমার ২য় পুরস্কার বাঁধা ছিল।

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি আমার প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। এক কথায় আমি খেলাধুলার পাগল ছিলাম। বাংলাদেশে যে সব খেলা প্রচলিত আছে একমাত্র গল্ফ ছাড়া ইন্-ডোর, আউট-ডোর সব খেলাই মোটামুটি আমি জানি। অর্থাৎ, Jack of all trades, master of none। হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবান্দা থেকে শুরু ক'রে লন্-টেনিস, বিলিয়ার্ড খেলা আমি জানি এবং সে সব খেলা অনেক খেলেছি। আমাদের সময়তো ফুটবল এখনকার মত সহজলভ্য ছিলনা। ছোটবেলায় বাতাবী লেবু ও খড়ের বল আমাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। খেলার প্রতি আমার প্রচন্ড আগ্রহ দেখে যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি তখন বার্ষিক পরীক্ষার কয়েকদিন আগে আব্বা একটা কঠিন শর্ত দিলেন- আমি যদি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হ'তে পারি তা'হলে আমাকে একটা ফুটবল কিনে দেওয়া হ'বে। খোদার ইচ্ছায় আব্বার শর্ত পূরণ করলাম। আব্বা বড় ভাইকে ফুটবল কিনবার ব্যবস্থা করতে বল্লেন। বড়ভাই কলকাতার এক দোকানে বলের জন্য অর্ডার দিলেন। ৪/৫ দিনের মধ্যেই ভি.পি.পি. যোগে ফুটবল এসে গেল। প্যাকেট খুলে দেখলাম একটা ফুটবল। আমাদের সবার আনন্দ আর ধরেনা। সেদিন থেকেই আসল ফুটবল নিয়ে খেলা শুরু। কিছু দিনের জন্য বাতাবী লেবু ও খড়ের বল রেহাই পেল।

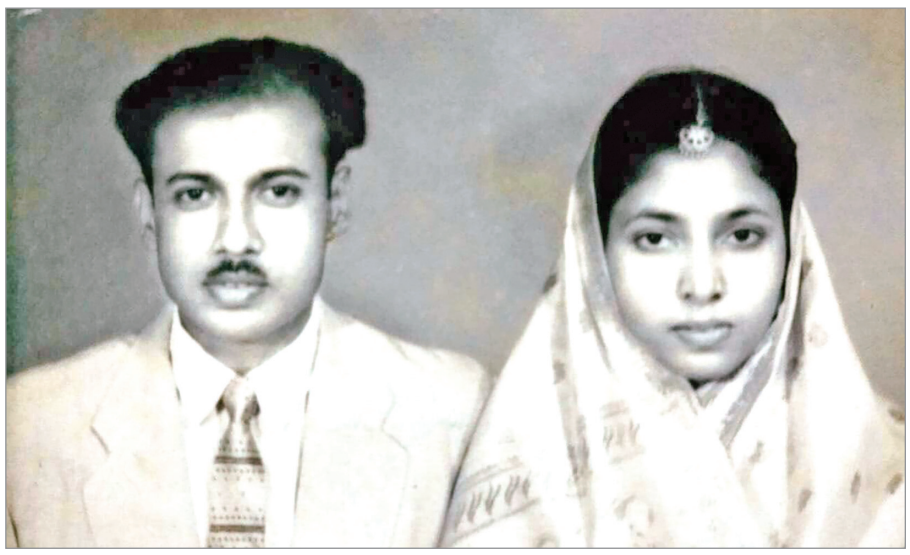
কলেজে আমরা শীতের দিনে ব্যাডমিন্টন খেলতাম। আমিনুল হক সাহেব, হালিমুজ্জামান ভাই, জালাল ভাই, কুদ্দুস সাহেব, শহুদ ভাই ব্যাডমিন্টন খেলতাম। টেনিস লনে আমরা টেনিসও খেলতাম। কোন বর্ষে নতুন খেলার উদ্বোধন হত ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। অর্থাৎ সারা বছরই কলেজে আমরা এটা-ওটা খেলতাম। খেলার কথা থাক্।

১৯৬৮ সালের ১লা মার্চ থেকে এডওয়ার্ড কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়। Existing staff দেরকে আত্মীকরণ করা হয়। যেহেতু এম. এ পরীক্ষায় লাড্ডা মেরেছিলাম সেজন্য আমার ভাগ্যে প্রভাষকের পদ জোটে। আমার অনেক ছাত্র-সহকর্মী সহকারী অধ্যাপক হয়। মাঝে মাঝে আফসোস হ'ত বৈকি! তবে হীনমন্যতায় ভুগতাম না- আগের মতই মাথা উঁচু করে বেড়াতাম। ১৯৬৯ সালে ড. শামসুদ্দিন মিয়া এডওয়ার্ড কলেজে প্রথম সরকারি অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করলেন। স্যারের কথা কি আর বলবো! উনি এসেই কিভাবে যেন আমাকে আবিষ্কার করলেন। প্রভাষক হলে হবে কি! তিনি আমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। পরবর্তীতে সকল অধ্যক্ষই আমার বেলায় একই ভূমিকা পালন করলেন। মাঝে মাঝে আমি সঙ্কুচিত হয়ে যেতাম কারণ তখন কলেজে তো একগুচ্ছ সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। এম.এ ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দেই দেই করেও দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ১৯৬৮ সালের আগে দিলে তো সহকারী অধ্যাপকই হতাম। অর্থাৎ গা' লাগাইনি। হঠাৎ ১৯৭৩ সালে ডি.পি.আই অফিস থেকে আমার নামে একটা লাল চিঠি এল যাতে লেখা ছিল– 'এক বছরের মধ্যে এম. এ-তে দ্বিতীয় শ্রেণি দেখাতে না পারলে আমাকে চাকুরিতে রাখা হবেনা'। চিঠিটা হাতে পেয়ে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম- সর্বনাশ! এই বয়সে চাকুরি গেলে বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে একদম খাদে পড়ে যাব। অবশ্য আমার live of second defence ছিল। অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাস করে হাইকোর্টের বিশেষ অনুমতি নিয়ে এক বছরের প্রবেশনারী পিরিওড শেষ করে রেখেছিলাম। ঢাকা হাইকোর্ট-এ সনদের জন্য ২৫ টাকা জমাও দিয়েছিলাম। ভাবলাম চাকুরি গেলে এই বয়সে বটতলা উকিল ছাড়া কিছুই হওয়া যাবেনা। শিক্ষকতা পেশা আমার এতো ভাল লাগতো যে ওকালতি করার কোনই মন-মানসিকতা ছিলনা। সেই সময় ওকালতি শুরু করলে আজকে পাবনা বারের একজন জ্যেষ্ঠ উকিল হতাম এবং কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাতে পারতাম।

যা হোক, ঐ লাল চিঠি আমার অহমিকায় প্রচন্ড আঘাত হানলো। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলাম যে করেই হোক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেব।

যে কথা সেই কাজ। কলেজে ক্লাস নেই- বাসায় রাত্রি জেগে বুড়ো বয়সে পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করি। এই ব্যাপারে আমার গিন্নীর পূর্ণ সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি। সেজন্য আমার ছেলে-মেয়ের মা-কে এই ফাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি, নইলে যখন এই লেখা ছাপা হবে তখন লেখাটা পড়ে আমাকে খোঁটা দিতে কসুর করবেন না। শেষমেষ হয়তো গৃহযুদ্ধ- মহা মহা বিপদ সঙ্কেত! যা হোক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিলেবাস, পরীক্ষা ফর্ম, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আনালাম। পরীক্ষার মাত্র চার মাস বাকি। সব পূরণ করে টাকা-পয়সা পাঠালাম। ১৯৭৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হবার কথা। আদাজল খেয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম। ক্লাসে পড়ানো এক কথা আর বেশি বয়সে পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করা আর এক কথা!

মোটামুটি প্রস্তুতি নিলাম। পাবনাতেই থাকতাম- কলেজে ক্লাস নিতাম, বাসায় পড়াশুনা করতাম এবং পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনের জন্য একদিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে ঐদিনই পাবনায় ফিরে আসতাম। এখানে আনসার ভাইয়ের নাম উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে। রাজশাহী গেলে আনসার ভাইয়ের বাসাতেই অবস্থান করতাম। ভাবী আমার থাকা খাওয়ার ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। সেজন্য ভাবীকেও ধন্যবাদ। ১৭ মার্চ, ১৯৭৪, পরীক্ষা শেষ হল। পরীক্ষা



বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ প্রফেসর ফখরুল ইসলাম, পাশে সহধর্মিণী রত্নগর্ভা ফরহাতুন্নেসা

দিয়ে একটুকু বুঝতে পারলাম ইনশআল্লাহ্ একটা দ্বিতীয় শ্রেণি পাব। তিনমাস পরে পরীক্ষার ফল বের হল এবং উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি পেলাম। অবশেষে আমার ছাত্রজীবনের অভাবনীয় কলঙ্ক ঘুচলো।

আমার পরীক্ষার ফলাফল অধ্যক্ষ সাহেব ডি.পি.আই অফিসে জানিয়ে দিলেন। ক'দিন পরেই আমাকে পটুয়াখালি সরকারী কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে বদলীর আদেশ দেওয়া হল। চিঠি পেয়েতো আমার মাথায় হাত! পদোন্নতি কিন্তু–আন্দামানে। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম পটুয়াখালি যাবনা–এডওয়ার্ড কলেজে যদি কোনদিন পদ খালি হয় তাহলে তখন দেখা যাবে। কাজেই যে প্রভাষক সেই প্রভাষকই থেকে গেলাম। এরইমধ্যে সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিল যে, লেনথ অব সার্ভিস-এর ভিত্তিতে existing সহকারী অধ্যাপকদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে সহযোগী অধ্যাপক (তখনকার সিনিয়র সার্ভিস BSES) করা হবে। এডওয়ার্ড কলেজ থেকেও আমার কয়েকজন সহকর্মী প্রমোশন পেয়ে বিভিন্ন কলেজে বদলী হয়ে গেলেন এবং অন্যান্য কলেজ থেকে এডওয়ার্ড কলেজে এলেন। আমি যদি তখন পটুয়াখালি কলেজে যোগদান করতাম তাহলে আমিও একইসঙ্গে সিনিয়র সার্ভিসে প্রমোশন পেতাম এবং এডওয়ার্ড কলেজেই আমার পোস্টিং হত। কারণ তখন এই কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স কোর্স চালু ছিল। হায়রে পোড়া কপাল- আমও গেল, ছালাও গেল। এতবড় সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবার ফলে মনে প্রচন্ড ব্যথা পেলাম- ভাবলাম আমাকে নিয়ে বিধাতা একি খেলা খেলছেন। রাজশাহী থেকে এসে আনোয়ার হোসেন সাহেব সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অর্থনীতি বিভাগে যোগদান করলেন।

দিন গড়িয়ে চললো। কলেজে ক্লাস ও বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি চলছিল। ছুটির মধ্যে মাঝে মাঝে কলেজে যেতাম এবং অধ্যক্ষ সাহেবের কক্ষে বসে অনেকেই গল্প-গুজব করতাম। ঐ সময় একদিন কলেজে গেলাম- দেখলাম অধ্যক্ষ সাহেবের কক্ষে বসে অনেকেই গল্প করছেন। আমি কামাল খান সাহেবের পাশে বসলাম। হঠাৎ হালিম শিকদার একটা গেজেটের কপি কামাল সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কামাল ভাই, দরখাস্ত করেন- আপনার যা' অভিজ্ঞতা তা'তে মনে হয় সুযোগ পেয়ে যাবেন।' আমি কামাল সাহেবের হাত থেকে গেজেটটি নিয়ে দেখলাম অর্থনীতিতে তিনজন সহযোগী অধ্যাপক নেবে বলে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। যেসব শর্ত দিয়েছে মিলিয়ে দেখলাম সবই আমার রয়েছে। আমার ছোট ভাইসম অধ্যাপক রশিদুল্লাহ্ও ওখানে ছিল। সে গেজেটটি পড়ে বলে উঠলো, 'ফখরুল ভাই, আপনিওতো দরখাস্ত করতে পারেন।' রশিদুল্লাহ্ কথা শুনে দেখলাম অনেকেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে- ভাবখানা যেন, রশিদুল্লাহ্ বলে কি! প্রভাষক থেকে একলাফে সহযোগী অধ্যাপক- পাগলা নাকি! ইংরেজির সহকারী অধ্যাপক প্রয়াত মুজিবর রহমান তালুকদার সাহেব আমাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি বল্লেন, 'দরখাস্ত করতে দোষ কি! না হলে না হবে।' সেদিনের জন্য আমাদের আড্ডা ভেঙে গেল। বাইরে আসার পরে তালুকদার সাহেব ও রশিদুল্লাহ্ আমাকে এমনভাবে চেপে ধরলো যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি দরখাস্ত করতে রাজী হলাম।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পিএসসি-তে মনে দ্বিধা-সংশয় নিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। ক'দিন পরে ইন্টারভিউয়ের জন্য চিঠি এল। আমি ও কামাল সাহেব একসঙ্গে ঢাকা গেলাম ইন্টারভিউ দিতে। সাক্ষাৎকারের তারিখ ছিল ১৪ই জুলাই, ১৯৭৫। সময়মত পিএসসি-তে হাজির হলাম।

সেখানে কামাল সাহেব ও আনোয়ার সাহেব আগেই এসে গিয়েছিলেন। আনোয়ার সাহেব তখন এডওয়ার্ড কলেজেই সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল পি.এস.সি-র সিলেকশন পেলে চাকুরী পাকাপাকি হবে। মোট নয় জন সাক্ষাতকার দিতে এসেছিলেন- সবাই সহকারী অধ্যাপক, আমিই একমাত্র প্রভাষক। যাঁরা অর্থনীতির বই লিখতেন তাঁদেরকে দেখলাম নোটের জাল ভর্তি নিজের লেখা বই নিয়ে সাক্ষাতকার কক্ষে ঢুকছেন। আমি বারান্দায় এক কোনায় চুপচাপ বসেছিলাম এবং সব লক্ষ্য করছিলাম। সাত নম্বরে আমার ডাক পড়লো। ভিতরে ঢুকে দেখলাম 'ইন্টারভিউ বোর্ড'-এর চেয়ারম্যানসহ তিনজন পি.এস.সি-এর সদস্য ও এক্সপার্ট বসে আছেন। আমি দুরুদুরু বুকে ঢুকতেই চেয়ারম্যান সাহেব সামনের চেয়ারে বসতে বলেন। চেয়ারম্যান সাহেব ডিগ্রির সার্টিফিকেটগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করার পরে আমার সাবজেক্ট 'অর্থনীতি' বিষয়-এর উপর প্রশ্ন শুরু হল। আমি একটুও না ঘাবড়িয়ে যথাসম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগ্‌লাম। কক্ষ থেকে বেরিয়ে আমি রিকশা নিয়ে সোজা বাসায় চলে এলাম। পরের দিনই পাবনায়। দিন গতানুগতিকভাবে চলে যাচ্ছিল। ইন্টারভিউয়ের কথা ভুলেই গেছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আনোয়ার সাহেব একদিন হঠাৎ বল্লেন, 'ফখরুল ভাই, রেডি হন পাবনা ছাড়তে হবে।' রশিদুল্লাহ পাশেই বসে ছিল। সে আনোয়ার সাহেবকে একরকম ধমক দিয়েই বলে উঠলো, 'ভনিতা না করে আসল কথা খুলে বলুন।' তখন আনোয়ার সাহেব হাসতে হাসতে বল্লেন যে, তিনি গতকাল ঢাকা থেকে এসেছেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইল দেখে এসেছেন যে, আমি এক নম্বর নমিনেশন পেয়েছি এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার নিয়োগপত্র এসে যাবে। আমি তো শুনে হতভম্ব। ভাল করে খোঁজখবর নেবার জন্য রশিদুল্লাহ জোর করে পরের দিনই ঢাকা পাঠালো। ঢাকায় গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম খবরটা সত্য। পরের দিনই পাবনা চলে এলাম। শিক্ষকমহলে চাপা গুঞ্জন- ভাবখানা যেন এও কি সম্ভব!

এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার নিয়োগপত্র এসে গেল যশোর এম.এম কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে। অধ্যক্ষ ড. আবদুর রহমান আমাকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠালেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন। ঘটা করে ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো। অনেকেই আমার সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কথা বললো। এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যা' হয় আর কি। শিক্ষকরাও বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লেন, 'অনেকদিন সরকারী কলেজে চাকুরি করছি। প্রভাষক থেকে একেবারে সহযোগী অধ্যাপক- আমার জানামতে শিক্ষা বিভাগে এমন নজীর নাই। ইসলাম সাহেব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন... ইত্যাদি।' একথা সত্যি, ছুটির মধ্যে



পারিবারিক ছবি

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

১০ পত্রিকার উনবিংশ শতাব্দী

দিলপাশারের মুখপত্র ছিল মাসিক বিজলী

মো. মহিউদ্দিন ভূঁইয়া



'বিজলি' পত্রিকার তথ্য অনুসন্ধানে পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার দিলপাশার গ্রামের ১০২ বছর বয়সী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে কথা বলছেন লেখক –সম্প্রীতি বাংলাদেশ

বর্তমান পাবনা জেলা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দিকে (বর্তমানের সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) যে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ হতো সেগুলোর মধ্যে বর্তমান ভাঙ্গুড়া উপজেলার দিলপাশার থেকে প্রকাশিত 'মাসিক বিজলী পত্রিকা' টি অন্যতম। পাবনার সংবাদপত্রের ইতিহাস থেকে জানা যায়- পাবনা জেলা থেকে সে সময়ে মোট ১০টি পত্রিকা প্রকাশ হতো। প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে সাপ্তাহিক ৩টি, পাক্ষিক ১টি, মাসিক ৫টি এবং দ্বৈমাসিক ১টি।

পাবনা নিবাসী রামসুন্দর রায় নামক জনৈক এক ব্রাহ্মণ পাবনা হিতৈষী কোম্পানি অফিস থেকে প্রথম 'পাবনা দর্পণ' নামের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর চাটমোহর নিবাসী শ্রীধর রায় কুন্ডুর উদ্যোগে এবং গুণাইগাছা গ্রামের ভেরবনাথ সিদ্ধান্ত-এর সম্পাদনায় গুণাইগাছা থেকে 'জ্ঞানবিকাশিনী নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, পাবনার হরিশ্চন্দ্র শর্মা তলাপাত্র কর্তৃক 'অণুবীক্ষণ' নামের মাসিক পত্রিকা, পাবনার মালঞ্চি গ্রামের দিবাকর প্রেস থেকে সেখানকার সরকার বাবুদের উদ্যোগে 'বার্তাবহ' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, দিলপাশার গ্রামের তৎকালীন জমিদার বামাচরণ মজুমদারের উদ্যোগে দিলপাশার থেকে 'বিজলী' নামের একটি মাসিক পত্রিকা, পাবনা থেকে 'ঊষা' ও 'জ্যোৎস্না' নামের দুটি মাসিক পত্রিকা, স্বর্গীয় কিশোরীমোহন রায় কর্তৃক পাবনা থেকে 'সুরাজ' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, পাবনা থেকে 'আরতি' নামের একটি দ্বৈমাসিক পত্রিকা এবং পাবনা থেকে 'শাশ্বত' নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হতো। বর্তমানে উল্লিখিত পত্রিকাগুলোর একটিও আর প্রকাশ হয় না।

দিলপাশার থেকে প্রকাশিত মাসিক 'বিজলী' পত্রিকা সম্পর্কে দিলপাশার এলাকার বর্তমান প্রজন্ম তো বটেই. শত বছরের বয়োবৃদ্ধ মানুষদেরও অজানা। ১০২ বছর বয়সের অধিকারী সাবেক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে জানান যে, তিনি বামাচরণ মজুমদার সম্পর্কে জানেন, কিন্তু বিজলী পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

পাবনা জেলার বর্তমান ভাঙ্গুড়া উপজেলার দিলপাশার গ্রামটি এক সময় 'বারেন্দ্র কায়স্থ প্রধান পল্লী' বলে পরিচিত ছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত বারিধি রচিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে জানা যায়- কানু নন্দিবংশীয় কোনো একজন দিলপাশার এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশে দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুত্রের নাম গঙ্গাচরণ মজুমদার ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম ভবানীচরণ মজুমদার। এছাড়া ত্রিপুরাসুন্দরী নামে এক কন্যা সন্তান ছিল তার। অন্য এক সূত্রে জানা যায়- মুরহরদেবের শেষ পক্ষের ছয় সন্তানের মধ্যে কারও বংশধর দিলপাশায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের পূর্বপুরুষ বলরাম মজুমদার। অর্থাৎ মজুমদার বংশীয় হিন্দু সম্প্রদায় হলো দিলপাশার গ্রামের আদি বাসিন্দা। এই বংশের কেউই আর দিলপাশার গ্রামে এখন নেই। বর্তমানে দিলপাশার গ্রামে ঘোষ সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও অবস্থাপন্ন। এছাড়া হালদার ও অল্পসংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বর্তমানে মিলেমিশে এখানে বসবাস করছেন।

ভাঙ্গুড়া উপজেলার দিলপাশার গ্রামের জমিদার বামাচরণ মজুমদার ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব, যিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালার জমিদার' নামের একটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মফস্বল বা গ্রামাঞ্চলে মুদ্রণযন্ত্র (প্রেস) ছিল না। তাই তৎকালীন পূর্ববঙ্গের দিলপাশারের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কোনো পত্রিকা সম্পাদনা বা পরিচালনা করা হলেও, তার ফাইনাল প্রিন্ট বা ছাপার কাজটি হতো কলকাতা, ঢাকা, বা পাবনা শহরের কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রেসে। জমিদার বামাচরণ মজুমদারের অর্থায়ন ও উৎসাহে এই মাসিক 'বিজলী' সাহিত্য পত্রিকাটি দিলপাশার থেকে আলোর মুখ দেখে। এটি মূলত ওই অঞ্চলের স্থানীয় লেখক, কবি ও গুণীজনদের সাহিত্যচর্চার একটি বড় প্ল্যাটফর্ম বা মুখপত্র হিসেবে কাজ করত। তৎকালীন সময়ে যাতায়াত ও যোগাযোগের এত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও একটি গ্রাম থেকে নিয়মিত মাসিক পত্রিকা বের করা তাঁর অদম্য সাহিত্যপ্রম এবং পৃষ্ঠপোষকতারই প্রমাণ বহন করে।

'বাঙ্গলার জমিদার' গ্রন্থটি ১৯১৩ সালে বামাচরণ মজুমদার কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত একটি ঐতিহাসিক বাংলা বই। ১৯১৩ সালে কলিকাতা ২১/১ নম্বর আন্টনী বাগান লেন হতে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হয়। মোট ১৮২ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ছিল এক টাকা। এই বইটিতে বাংলার জমিদারদের ইতিহাস, তাদের সমাজ সংস্কার, প্রজা পালন এবং সেকাল থেকে একালের জমিদারদের ভূমিকা ও কার্যাবলির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।



বাঙ্গলার জমিদার

শ্রীবামাচরণ মজুমদার প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা ২১।১ নং আন্তনী বাগান লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বাঙ্গলার জমিদার / শ্রীবামাচরণ মজুমদার প্রণীত। / প্রথম সংস্করণ। / কলিকাতা ২১।১ নং আন্তনী বাগান লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

তথ্যসূত্র : ১। রাধারমণ সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ৩৩৭

এডওয়ার্ড কলেজের স্মৃতিময়

৪-এর পৃষ্ঠার পর : সেদিন যদি আমি কলেজে না যেতাম এবং হালিম শিকদার যদি কামাল সাহেবকে গেজেটটা না দেখাতো, তাহলে আমি কিছুই জানতে পারতাম না এবং এই দুর্লভ সুযোগটা কোনোদিনই পেতাম না। সবই খোদার ইচ্ছা। আমার সব গ্লানি নিমিষে মুছে গেল।

১৯৭৬ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি আমি এডওয়ার্ড কলেজ থেকে রিলিজ নিলাম। এডওয়ার্ড কলেজে একটানা বাইশ বছরের শিক্ষকতা জীবনের ছেদ পড়লো। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে রকেট ট্রেনে চেপে যশোর গেলাম। পুরাতন কলেজ ক্যাম্পাসে প্রফেসরদের মেসে উঠলাম। পরেরদিন অর্থাৎ ১লা মার্চ কলেজে যোগদান করলাম। কলেজে আমাকে নিয়ে মাত্র দু'জন সহযোগী অধ্যাপক হলাম। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব তখন কলেজের অধ্যক্ষ। চৌধুরী সাহেব ব্রীজ ও ব্রে খেলার পাগল ছিলেন। রোজ তাস খেলায় উনাকে সঙ্গ দিতে হত। কয়েকদিনের মধ্যেই ছাত্র শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলাম। তাদের কাছে প্রিয়ও হয়ে উঠলাম। বৌ-ছেলে-মেয়ে সবাই তখন পাবনার বাসায়। আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে চুক্তি ছিল উনি রাজশাহী কলেজের জন্য এবং আমি এডওয়ার্ড কলেজে আসার জন্য চেষ্টা করবো। নানা ঘাপলার জন্য আমাদের দ্বৈত প্রয়াস সফল হতে বেশ দেরি হয়ে গেল। অবশেষে ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে আমার বদলীর আদেশ হল। ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দিল। অনার্সের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা আলাদা আলাদা ভাবে ফেয়ারওয়েল দিল। ১৯৭৭ সালের ৩১ শে অক্টোবর দুপুর বেলা আমার বিভাগীয় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা যশোর রেল স্টেশনে আমাকে বিদায় জানালো। ১লা নভেম্বর এডওয়ার্ড কলেজে যোগদান করলাম। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম। আনোয়ার সাহেব আগেই রিলিজ নিয়ে রাজশাহী কলেজে চলে গিয়েছিলেন। তখন এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন ড. মোসলেমউদ্দিন। ঢাকায় পড়ার সময় উনার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমরা সলিমুল্লাহ হলে ওয়েস্ট হাউজে থাকতাম। কাজেই নতুন করে অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হলনা।

এডওয়ার্ড কলেজে আবার আমার কর্মজীবন শুরু হল। নতুন করে অনেক কমিটির আহ্বায়ক হলাম। ১৯৮১ সালে ডি.পি.আই অফিসে প্রফেসর হিসেবে প্রমোশনের একটা লিস্ট হয়েছিল। আমাকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে দেখানো হয়। পরিবর্তন করে রাজশাহী কলেজে আমার নাম ঢুকাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। পরবর্তীতে কোন ঘাপলার জন্য এই লিস্ট কার্যকরী হয়নি। অবশেষে আমাকে প্রফেসরের পদ নিয়ে পাবনা সরকারি বুলবুল কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হল। ১৯৮৪ সালের ১৪ এপ্রিল আমার প্রিয় এডওয়ার্ড কলেজের মায়া ছেড়ে বুলবুল কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিলাম। বুলবুল কলেজে আমিই প্রথম সরকার নিযুক্ত অধ্যক্ষ।

এডওয়ার্ড কলেজে ২৮ বছরের চাকুরি জীবনের কত স্মৃতি জমা হয়ে আছে। ১৯৬১ সালে 'পাকিস্তান ইকোনোমিক এসোসিয়েশন'-এর বার্ষিক সভার স্থান নির্ধারণ করা হয় প্রক্সু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ শহরের সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সোলেমান মন্ডলের নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি দলকে ঐ কনফারেন্সে পাঠানো হয়। এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আমি ও রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে কামাল খান সাহেব ঐ দলে অন্তর্ভুক্ত হই। আমরা এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে দুপুর ১টায় করাচীর উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে সন্ধ্যা ৭ টায় করাচী বিমান বন্দরে পৌছাই। পরের দিন সকালে হায়দ্রাবাদ রওয়ানা দেই। হায়দ্রাবাদ স্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। ঐ শহরে ঢুকতেই বাঁদিকে হায়দ্রাবাদ দুর্গ যেখানে রেডিও স্টেশন, তার উল্টোদিকে হোটেল 'সিজা'তে আমরা সবাই উঠলাম। আমি আর কামাল সাহেব দোতলার একটা রুমে উঠলাম ঐ দিন বিকেল থেকে কনফারেন্স শুরু হল সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে। তিন দিন কনফারেন্স চলেছিল। কামাল সাহেব ও আমি ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়তাম শহরটা দেখতে। এক্কা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়তাম দু'জনে। 'ঠান্ডি সড়ক বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্টের মাঝ দিয়ে করাচীর দিকে চলে গেছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ, সমস্ত রাস্তা ছায়া ঘেরা। 'ঠান্ডি সড়ক নামটা সার্থক। একদিন বিকেলে সবাই দলবেঁধে ট্যাক্সি করে গোলাম, মহম্মদ ব্যারেজ দেখে এলাম। ক্লাসে ছাত্রদের এই ব্যারেজ সম্বন্ধে পড়িয়েছি- এবার সচক্ষে দেখে এলাম। তিনদিন পরে করাচী ফিরলাম এবং আমার মামাতো ভাই শামসুল আলমের ফ্রিয়ার রোডের মেসে উঠলাম। সে তখন সবে পাকিস্তান ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন-এ চাকুরিতে ঢুকেছে। তিনদিন করাচীতে ছিলাম। যে করাচী শহরটা দেখলাম- তখন সেটা পাকিস্তানের রাজধানী।



এডওয়ার্ড কলেজের স্মৃতিময় বারান্দা

ক্লিফটন বীচ, ম্যানোরা দ্বীপ, গান্ধী মিউজিয়াম, ইত্যাদি দেখলাম। তিনদিন পরে আমি ও কামাল সাহেব একসঙ্গে ঢাকা ফিরলাম।

পাকিস্তান আমলে প্রতিবছর ঢাকায় শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হত। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হবার সুবাদে আমার নেতৃত্বে পাবনার দল যেত। আমার ছাত্রী রূপবাণী শিকদার, রেনু অধিকারী, অনিমা রায় ও আরও অনেকে আমার সঙ্গে গিয়ে এডওয়ার্ড কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। একবছর সবার উপর টেক্কা দিয়ে অনিমা সারা পূর্বপাকিস্তানে গানে চ্যাম্পিয়ন হল। সেবার প্রখ্যাত গায়িকা নীনা হামিদও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্ররা চিরদিনই রাজনীতি সচেতন ছিল। আমার সহপাঠী বন্ধু মীর্জা আবদুল হালিম কিছুদিনের জন্য জেনারেল জিয়া সরকারের প্রতিমন্ত্রী হয়েছিল। আমাদের ছাত্র ফজলুর রহমান পটলও বেগম জিয়ার আমলে প্রতিমন্ত্রী ছিল। মন্ত্রী মহম্মদ নাসিমও আমার প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিল। সে একবার ছাত্র সংসদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল। আমি ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলাম বলে নাসিমের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদও আমার ছাত্র ছিল। ওরা এখনও আমাকে তাদের শিক্ষক হিসেবে অকৃত্রিমভাবে শ্রদ্ধা করে। সংসদের এমপি-র মধ্যে চারজনই আমার ছাত্র।

পাবনায় এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে শিক্ষক হিসেবে আমার ছাত্র-ছাত্রী নেই। শিক্ষকতা করে আমি কোনো বাড়ি করিনি, কোন সম্পদ করিনি। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের অঢেল শ্রদ্ধা পেয়েছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দল শহীদ ড. শামসুজ্জোহার নেতৃত্বে আমাদের কলেজে এসেছিল। জোহা আমার বাসাতেই সস্ত্রীক উঠেছিল এবং এক রাত আমার বাসাতেই ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জোহা আমার জুনিয়র ছাত্র ছিল। আমরা সলিমুল্লাহ হলের ওয়েস্ট হাউজে থাকতাম। তখন থেকে জোহার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ড. জোহা আমাকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করতো। সদা প্রফুল্ল জোহাকে পাক সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে। আজ লিখতে বসে জোহার কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছে। এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনাকালে আমি একাধিক সেমিনারে কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছি। যশোর বোর্ড, ঢাকা বোর্ড ও রাজশাহী বোর্ডে প্রধান পরীক্ষকসহ পেপার সেটার, মডারেটর ও পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ক্লাসে পাঠদানের সময় আমি খুব কঠোর ছিলাম। আমার ক্লাসে প্রক্সি দেয়ার কোন সুযোগ ছিল না। কলেজে এবং কলেজের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আহ্বায়কের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে। এসব আমি যথাযথভাবে পালন করেছি। এসব ঝামেলা থেকে এখন আমার মুক্তি। এডওয়ার্ড কলেজের ইট-কাঠ, প্রতিটি ধুলিকণার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড়। আরও কত টুকরো টুকরো স্মৃতি লেখা হল না। তারা আমার অন্তরেই থাকুক। এডওয়ার্ড কলেজের বয়স একশত বছর পূর্ণ হল। প্রত্যাশা করছি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এই শতবর্ষ উৎসব পালিত হবে। পুরাতন ও নতুনের সম্মিলনে কলেজ চত্বর মুখরিত হোক। পুরাতনেরা কলেজ অঙ্গনে ঢুকে তাদের তারুণ্যের স্মৃতি রোমন্থন করুক। শতবর্ষ পালন সুন্দর হোক, সার্থক হোক। আমার প্রাণের এডওয়ার্ড কলেজ চিরজীবী হোক। আমরা থাকবো না- এডওয়ার্ড কলেজ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ফুলে-ফলে ভরে উঠুক।

[এডওয়ার্ড কলেজ শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মারক থেকে সংকলিত]

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ



সাতবারিয়ায় পদ্মা ব্যারেজের প্রকল্প এলাকা



কারিগরি টিমের ডিস্প্লে



পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে বক্তব্য রাখেন পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

বছরের শুরুতেই পদ্মা ব্যারেজের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : ‘২০১৬ সালে তিস্তা ব্যারাজসহ বড় বড় প্রকল্প নিয়ে মানুষের নানা প্রত্যাশা থাকলেও সদিচ্ছার অভাব এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভাবে তা বাস্তায়িত হয়নি’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান নির্বাচিত সরকার দেশের স্বার্থ ও জনগণের অধিকারকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে এই মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ‘নির্বাচিত হওয়ার আড়াই মাসের মাথায় বর্তমান সরকার এমন একটি সাহসী উদ্যোগ নিয়েছে’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হলেও তা সফল করতে আমরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি। প্রথম পর্যায়ে এ প্রকল্পের জন্য প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়সহ মোট ৫০ থেকে ৫৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প শেষ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রায় সাত বছর মেয়াদী এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা কম-বেশি সময় লাগতে পারে।

প্রকল্পের সুফল তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, দেশের তিন ভাগের এক ভাগ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৭ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের সুফল ভোগ করবে। এর মাধ্যমে ওই অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

এদিকে কারিগরি আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক হাসান মাহমুদ জানান, নদীর গভীরতা পরিবর্তনের কারণে ২০১৬ সালে প্রণীত পদ্মা ব্যারেজের নকশায় অবস্থানগত কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আগামী দেড় বছরের মধ্যে সব সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ করা হবে। এই ব্যারেজের উজানে ১৬৫ কিলোমিটার নদী অংশে পানি রিজার্ভ করা হবে। এর ফলে পানির চাপ ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাবনাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার শহর রক্ষা বাঁধের উচ্চতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টিও প্রকল্পে রাখা হয়েছে। এছাড়া বর্ষাকালে ব্যারেজের ৭৮টি গেটই খোলা থাকবে, ফলে বড় ধরনের বন্যার কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

ও কারিগরি টিমের সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট সেলিম রেজা হাবিব, পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, পাবনা-সিরাজগঞ্জ সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আরেফা সুলতানা রুমা, মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এ কে এম শাহাবুদ্দিনসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

পাখি আসছে দলে দলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : ও জলাশয় ঘিরে চলছে পাখি শিকারের মহোৎসব। লতাপাতা দিয়ে তৈরি ঝোপের ওপর জাল পেতে এবং বাঁধা পাখিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিদিনই শিকার করা হচ্ছে দেশীয় ও অতিথি পাখি। শিকার করা এসব পাখি অনেকটা প্রকাশ্যেই মানুষের খাবার হিসেবে বিক্রি হচ্ছে হাট-বাজারে।

নাম পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পাখি শিকারী যা বলেছেন তার মর্মার্থ হলো, তারা এক-একজন গত মাস থেকে প্রতিদিন নিজ এলাকা ও আশপাশে ঘুরে ছয়-সাতটি করে পাখি শিকার করেন। প্রতিটি পাখি ২০০ থেকে ২৫০ টাকায় বিক্রি করে দিনে প্রায় দেড় হাজার টাকা আয় করেন।

এই বাস্তবতার ব্যাপারে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, উল্লাপাড়া, নাটোরের সিংড়া, গুরুদাসপুর এবং পাবনার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া এলাকায় পাখি শিকার বন্ধে কাজ করা ‘চলনবিল জীব ও বৈচিত্র্য রক্ষা কমিটি’র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পাঁচ বছরে অন্তত দুই হাজার শিকার করা পাখি উদ্ধার করে অবমুক্ত করেছেন তারা। কিন্তু শিকারিরা তাদের ভয় না পাওয়ায় পাখি শিকার পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা প্রয়োজন।

দি বার্ডস সেফটি হাউজের চেয়ারম্যান মামুন বিশ্বাস বলেন, শিকার করা পাখি উদ্ধার করে অবমুক্ত করা হলেও তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতার অভাব এবং সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ের ঘাটতিতে পাখি শিকার স্থায়ীভাবে বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

পাখি নিধনের ক্ষতি সম্পর্কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামের ভাষ্য হলো, পাখি নিধন দন্ডনীয় অপরাধ। খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য পারিযায়ী ও দেশীয় পাখি চলনবিলে আসে। এসব পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশকে রক্ষা করে। তাই পাখি শিকার বন্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়া উচিত।

তাড়াশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নুসরাত জাহান বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী পাখি বা পারিযায়ী পাখি হত্যা অপরাধ। এ অপরাধে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড হতে পারে। পাখি শিকারের তথ্য পেলে অভিযান পরিচালনা করে তা বন্ধের চেষ্টা করা হচ্ছে।

সার্বিক বিষয়ে ওয়াকেবহালদের অভিমত- প্রশাসন, পরিবেশকর্মী ও স্থানীয় মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ থাকলে চলনবিলের পাখিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব। বিস্তীর্ণ জলরাশি, সবুজ প্রকৃতি আর পাখির অবাধ বিচরণ- সব মিলিয়ে চলনবিল হতে পারে প্রকৃতিনির্ভর পর্যটনের আকর্ষণীয় গন্তব্য। শীতের সকালে পাখি দেখা, জলাভূমির সৌন্দর্য উপভোগ কিংবা প্রকৃতির ছবি তুলতে এখানে আসতে পারেন ভ্রমণপিপাসুরা। এতে একদিকে পর্যটনের সম্ভাবনা বাড়বে, অন্যদিকে সুরক্ষিত থাকবে চলনবিলের প্রাকৃতিক পরিবেশ।



সাংবাদিক আবদুল জব্বার আর নেই



■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক, সাংবাদিক-কলামিস্ট, গ্রন্থ লেখক, পাবনা প্রেসক্লাবের সন্মানিত সদস্য আবুদল জব্বার (৭১) গত ২৪ অক্টোবর চীর বিদায় নিয়েছেন। পাবনা সদরের মালিগাছায় অবস্থিত নিজ বাসভবনে ভোর ৪ টায় তিনি প্রয়াত হন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরিক জটিলতা ও অসুস্থতায় ভুগছিলেন এবং শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন ছেলে রেখে গেছেন। ওইদিনই বাদ জোহর মজিদপুর ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে তাঁর লাশ মজিদপুর কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল জব্বার বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রে নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কলাম লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর লেখা একাধিক গ্রন্থও রয়েছে। অভাব-অনটনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবদুল জব্বার সাংবাদিকতা ছাড়াও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, সিপিবি’র রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেছেন। দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। আজীবন তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথ কাঁপিয়েছেন। ভোগ করেছেন জেল, জুলুম, হামলা-মামলা-অত্যাচার-নির্যাতন। তিনি এক সময় মালিগাছা ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্যও ছিলেন।

সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল জব্বারের মৃত্যুতে সাংবাদিক সমাজ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ও পাবনা প্রেসক্লাবের জীবন সদস্য মো. সাহাবুদ্দিন, পাবনা-৫ (সদর) আসনের সংসদ-সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বেসরকারি টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাটকোর সভাপতি ও পাবনা প্রেসক্লাবের জীবন সদস্য অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে আখতারুজ্জামান আখতার ও জহুরুল ইসলাম। ২৫ অক্টোবর পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে তাঁর স্মরণে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজীবন বিপ্লবী আবদুল জব্বারের এই প্রয়াণে শোকাহত হয়েছেন তাঁর বিপুল সংখ্যাক ভক্ত, সহযোদ্ধা ও শুভাকাঙ্ক্ষি।



২৫ অক্টোবর পাবনা প্রেসকাব মিলনায়তনে আবুদল জব্বার স্মরণে একটি শোকসভা



বাগান গড়ে তোলার পরিবেশ পাকশীতে

সৈয়দ মুসতাফী বৃত্তা

'পাকশী পর্যটন কেন্দ্র হবে' এ আশা শুধু পাবনাবাসীর নয়, অনেক ভ্রামনিকই তা চান। কিন্তু ইচ্ছা আর তা পুরণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। পাকশীর মাটি উর্বর। কিন্তু সৌন্দর্য বাড়াবার উদ্যোগে নেই। এখানে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও কোমল কান্ত উদ্ভিদ আবাদের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। কেবল উদ্যোগ চাই। গরু-ছাগলে মুখ দেয় না এমন বৃক্ষের মধ্যে বাঁদর লাঠি বা সোদাঁল গাছ বিনা যত্নে বড় হয়। ফুলেল বসন্তে এ গাছে অজস্র ফুল ফোটে। রেল লাইনের ঢালে বা বাঁধের ঢালে এ ধরণের গাছ পর্যটকদের মন মেজাজ আনন্দে ভিজিয়ে দেবে। ঈশ্বরদী রেলওয়ে সড়কের দু'পাশের প্রান্তিক ভূমিতে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে বা নদীর পাড়ে সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলার পরিবেশ রয়েছে। খেজুর চারা রোপন করলে সৌন্দর্য আরও বাড়বে। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ উন্নয়নের জন্য বট, পাকুর, জাম প্রভৃতি প্রয়োজন। এছাড়া গোলাপী ক্যাসিয়া আর জাভা ক্যাসিয়া গাছ রোপন করে বৈচিত্র্য আনা যায়। কালকাসুন্দেও শোভাবর্ধন করে। এই গাছের ঘন সবুজ পাতার সঙ্গে মিশে থাকে হলুদ ফুলের সৌন্দর্য। গরমের সময় দীর্ঘ দিন ধরে হলুদ ফুলের স্তবক ডালে ডালে ঝুলে থাকে। কালকাসুন্দের লম্বা লম্বা চ্যাপ্টা ফলের সঙ্গে অনেকে পরিচিত। সামাজিক বনসৃজনের কর্মসূচিতে এ গাছ তালিকাভুক্তি করা যায়। রেল বিভাগের যে বাগান আছে তা দায়সারা গোছের।

পাকশী টিকিট কাউন্টার সংলগ্ন সংক্ষিপ্ত বাগানে ক্যাসিয়া রেনিজেরা মানাবে ভালো। বাগান প্রশস্ত করলে বৃক্ষবিথি তৈরি করা যায়। গ্রীষ্মের দুপুরে পর্যটকদের ছায়া সৃষ্টি করবে এই সব গাছ। পাশাপাশি পলাশও মন জুড়িয়ে দেয়। শেষ শীতে পাতাহীন ডালে ডালে জেগে ওঠে সিঁদুরে পাপড়ি। সৃষ্টি করে অসাধারণ দৃশ্য। এ ফুলের আকর্ষণে মৌমাছি ও নানা প্রজাতির পাখি ভিড় জমায়। প্রায় এক মাস ধরে চলে ফুল ফোটানোর খেলা। পদ্মা তীরে পলাশ বাড়ে অবাধে। ফুল ফোটা পর্ব শেষে গাছ ছেয়ে যায় পাতলা পাতলা সবুজাভ ফলের লম্বা লম্বা পাতা আর দুধ সাদা ফুল। দর্শক টানে। বাতাসে মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে দেয়। পায়ে চলা পথের পাশে কুরচি একেবারে মানানসই। সুবাস পিয়াসীরা ফুরফুরে মেজাজে ঘুরঘুর করবে। ফিরে ফিরে আসবে পদ্মা তীরে। কিন্তু পদ্মাও দূরে সরে গেছে। বর্ষা ছাড়া পাকশীতে থাকে না। গরু-ছাগলের পসন্দ নয় এমন অনেক লতা আছে যা কলোনী দেয়ালে মানানসই। রুশনে লতা, প্রবাল লতা, নারঙ্গী লতা, রেল লতা ও অলক্ত মঞ্জুরী দিয়ে কাঁটা তার সাজানো যায়। শরতে ও বসন্তে থোকা থোকা লাল-বেগুনী ফুল। প্রবাল লতা আগাছার মতো জঙ্গল সৃষ্টি করে ফেলে। এ লতায় প্রায় সারা বছর ধরে ফুল ফোটে। নারঙ্গী লতার বেঁটে বেঁটে শাখায় থোকা থোকা ফুল ফোটে। কমলা রঙের এই ফুল সারা বছর দেখা যায়। অলক্ত মঞ্জরী অনেকটা রঙ্গন ফুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। শীতকালে ঘন লাল ফুলের থোকায় ভরে যায় গাছ। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বর্ষাকালের শেষেও একবার ফুল ফোটে। রেলের শহর পাকশীতে রেল লতা থাকবে না- এ হতে পারে না। পাঁচিল বেয়ে উঠতে রেল লতা বেশ পারদর্শী। বাড়েও দ্রুত। গোলাপী নীলাভ ফুল ফোটে সারা বছর। আকারে চোঙের মতো। লতা না ছাঁটলে সীমার মধ্যে আটকে রাখা যায় না।

গুল্ম শ্রেণীর গাছের মধ্যে রয়েছে কলকে, করবী, ক্যাসিয়া, কামিনী, ক্লেরোডেনড্রেন, জ্যাট্রোকা, টগর, ধুতরো, নিশিন্দা, ল্যান্টানা, বেড়া কলমী, হাসনুহেনা প্রভৃতি। করবী গুল্মে ফুল ফোটে অনেক দিন। গাঁটে গাঁটে থাকে তিনটে করে সবুজ পাতা। কলকে ফুল হলুদ বর্ণের। পাতার কোলে কোলে ফোটে হলুদ ফুল। ক্যাসিয়া এলাটা আর সোফোরাও হলুদ ফুল দিয়ে থাকে। পরিবেশের সৌন্দর্য আরও বাড়ায় কয়েক রকমের ক্লেরোডেনড্রেন। বেড়াবার জায়গাগুলোতে এ গুল্ম মানায় ভালো। কামিনীর দেহ সৌষ্ঠব আর সুন্দর থোকা থোকা সাদা ফুলের ঘ্রাণও মন মাতায়। হাস্নাহেনার তীব্র সুবাস মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। পাকশীতে এমারিলিশ গোত্রের উদ্ভিদসহ অনেক গাছই দেখা যায়। চওড়া ফিতের মতো পাতার এগাছ পর্যটকদের না টানলেও বাগান সাজানোর জন্যে উপযোগী। পাশাপাশি আছে চন্দন কুচ। পাতার ওপর লাল ও সাদা রঙের ফোঁটা।

পর্যটক ও যারা শিক্ষা সফরে যান তাদেরও উপকারার্থে রুচি সম্মতভাবে বৃক্ষরোপণ করে বড় করতে পারলে পাকশীর সৌন্দর্য আরও বাড়বে। কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক দৃশ্য মিলেমিশে অনন্য করে তুলবে স্থানটিকে। কিন্তু উদ্যোক্তাও পরিকল্পনা রূপায়নকারীর দেখা মিলছে না।

নবীন মেঘের আনাগোনা আকাশ জুড়ে। এ সময় বৃষ্টির নুপুর বাজে হার্ডিঞ্জ সেতুর ভাঁজে ভাঁজে। শ্রাবণ শাসানো দিনে পাকশীতে লাভ করা যায় অন্য রকম অনুভূতি। এখানকার নিজস্ব ভৌগলিক স্বরূপটি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আবেগে-অনুভবে আকাশে-বাতাসে দেখা যায় নানা চেহারা। প্রাক সন্ধ্যায় ঘাসের কার্পেটে খেলা করে কীট পতঙ্গ। কল্পনায় স্বপ্ন চালিতের মতো পদ্মার উজানে ধেয়ে গেলে পাওয়া যায় মৌসুমী হাওয়ার রাণী শরীরের বিমুগ্ধ সংকেত। সোঁদা মাটির ঘ্রাণ ভাসা সময়ে পাখির কলকাকলি, হাওয়ার শব্দ, পাতার সঙ্গে পাতার কানাকানি মিলেমিশে একাকার। রোদ-বৃষ্টির খেলা চলে সারাদিন। সন্ধ্যার পর পরই ভেসে বেড়ায় জোনাকি তারার কুহক। যারা প্রকৃতি প্রেমিক তারা বর্ষাকালের হৃদস্পন্দন ফিরে ফিরে অনুভব করেন। একশো বছরেও পাকশী পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেল না! এটা গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে স্থান পাবার যোগ্য। নঞর্থক কৃতিত্ব হিসেবে। সংস্কৃতির পীঠ স্থানে এক ঝাঁক কৃতিত্ববানের এই জেলার এ এক গভীর লজ্জা।

বর্ষাকালে পর্যটকদের তেমন আনা গোনা থাকে না। তারপরেও যে দু'চারজন যান, তারা স্নিগ্ধ শ্যামল গাছ-গাছালি ঘেরা ব্রিটিশ বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চার পাশে চোখ মেলেন। বিংশ শতককে মনে হয় যেন কত আলোক বর্ষ দূরে। বৃষ্টি নিরোধক পোশাক পরে বা ছাতা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে নদী তীরের বাঁধে হাঁটতে অন্য রকম লাগে। যখন আকাশ কালো হয়ে আসে, মেঘের ডমরু বেজে ওঠে গুরু গর্জনে তখনই বা তারপরে শ্রাবণের ঢল নামলে ছাতায় বৃষ্টি বাধা মানে না। গা ভিজে ওঠে। কখনো বা মনে বিরক্তির বাতাস আসা যাওয়া করে। এ সময় নদী আকাশ-আর সেতুর দিকে তাকালে অনুভব করা যায় আকাশ নদী একাকার। খাঁটি অক্সিজেনে মনটা ভরে ওঠে।

পাকশিতে ঘন জঙ্গল নেই। ঝোপ-ঝাড় আর বেশ কয়েকটি বাগ বাগিচা আছে। শতবর্ষী শীল কড়ই আছে অনেক গুলো। বাজারের পথ ধরে এগুলে এসব বৃক্ষ দেখা যায়। সবই রেল এলাকা। রেলের শহর পাকশি। সড়কের দুপাশে বৃক্ষ শাখা ছেয়ে আছে চাঁদোয়ার মতো। গাছতলায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত ছোঁয়া বিকেলের বৃষ্টিতে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। বেশ নির্জন। নিরিবিলি। শ্রাবণ ঢলে ডুবে যায় পাকশী প্রান্তর। কিন্তু উপভোগ করার মতো ছাউনি নেই।

বন-পাহাড়ের সৌন্দর্য নেই। ইস্পাত-ও পাথুরে পরিবেশে কল্পনায় উঠে আসে জলীয় বাষ্পের ঘ্রাণ। ভেজা হাওয়ায় হাঁটতে হাঁটতে মিশে যাওয়া যায় বর্ষার গহনে। বৃষ্টির খিলান, টেরাকোটা আর বৃষ্টির দেয়াল হার্ডিঞ্জ সেতুর গায়ে ভেসে ওঠে। এসব কারুকাজ অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় শিল্পী চোখে। প্রায় ভরা পদ্মার শরীর জুড়ে শব্দ তরঙ্গের ঢেউ ভাঙে। থোকা থোকা বৃষ্টি গর্ভ মেঘ ভেসে যায় নদীর ওপর দিয়ে। জোড়া সেতুর আকাশে ছানা কাটা মেঘের আনাগোনা সবাই খেয়াল করেন না। এ সময় প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাতে বিকেলেই দিন রাতের ভেদাভেদ মুছে যায়। নামে অন্ধকার। পাকশীর মাহাত্ম্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়তার কথা যতটা বর্ণনাযোগ্য তার অধিক অনুভবময়। বাধের সবুজ গা বেয়ে স্থানে স্থানে বৃষ্টির পানি নামে প্রপাতের মতো। শেষ আষাঢ়ের ঝড়ে বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ। বৃষ্টি ভেজা পাকশীর ছবি নেয়না কেউই।

মাঝে মধ্যে লাগাতার বৃষ্টি লেগে থাকে। যেন প্রাকৃতিক তান্ডব। বিপর্যয় নেমে এলে তখন ঘরে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বৃষ্টিতে বিরক্ত বোধ হলে স্টেশন কাউন্টারের সামনের বেঞ্চিতে বসেও শান্তি নেই। পানি পড়ে। এরই মধ্যে এখানে ঝম ঝম সুর তুলে ট্রেন এসে দাঁড়ায়। যাত্রীরা ভিজতে ভিজতে ট্রেন থেকে নেমে সিড়ি বেয়ে আসেন। মেঘলা আকাশ আর শীতালো হাওয়া ধৌত পাকশীর প্রকৃতি অনুভবে উঠে আসে। বর্ষার বন্দনা শোনা অনেকের ভাগ্যেই হয় না। যখন আকাশ ঝেঁপে অলস ভঙ্গিতে বৃষ্টি নামে তখন কেউ সহজে ভিজতে চান না। নদী তীরে বাঁধের পাশে পাকা ছাউনি গড়ে তুললে পর্যটকদের বেশ সুবিধা হবে। পদ্মার পাড় খাবলানো ঢেউ দেখার কথা মন থেকে মুছে যাবে না কখনো। কারণ সমুদ্রের ধারে তো নোনা হাওয়া আর পদ্মের অববাহিকায় মিঠা পানির হাওয়া আরও ভাল। এর সঙ্গে কারও তুলনা করা চলে না। পদ্মার হাওয়া পদ্মা তীরেই উপভোগ্য। পাকশীতে ভেষজ বাগান গড়ে তোলা হলে শিক্ষা সফরে যারা যান তারা উপকৃত হবেন। পর্যটকেরাও খানিক স্বস্তি লাভ করবেন। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসবেন হেকিম-কবিরাজেরা। জমে উঠবে ভেষজ হাট -বাজার। প্রকৃতির নিয়ামকপুষ্ট জীবনদায়ী ভেষজ আবাদের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। কেবল পর্যবেক্ষণ করে উদ্যোগ নেবার অভাবই রয়ে গেছে। ২০০৪ খৃস্টাব্দে বন মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, ১০ একর খাস জমির ওপর ওষুধি বাগান সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু প্রশাসন গুরুত্ব না দেওয়ায় এখানে আজও বাগান গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি।

পাবনার ১৯৮ বছর পূর্তিতে কেক কাটা ও মিষ্টি মুখ

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের ১৯৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে পাবনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে পালিত হয়েছে শুভ পাবনা দিবস। ১৬ অক্টোবর রাতে পাবনা প্রেসক্লাবে কেক কাটা, মিষ্টিমুখ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যদিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কেক কাটেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। এ সময় সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আবু আশ্রাফ, পাবনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম ও কামনা ফাউন্ডেনের চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী কামনা। পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতারের সভাপতিত্বে ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আঁখিনূর ইসলাম রেমনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সিনিয়র সাংবাদিক আবদুল মতীন খাঁন, মির্জা আজাদ, কাজী মাহবুব মোর্শেদ বাবলা, শহীদুর রহমান শহীদ, আবদুল হামিদ খাঁন, আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু, রিজভী জয়, পাভেল মৃধা, রাজিউর রহমান রুমী প্রমুখ। বক্তারা বলেন, পাবনার রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবময় অতীত। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ জেলার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জেলার ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। পাবনার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি জেলার সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগাতে হবে।



মুড়িকাটা পেঁয়াজের আবাদ

শেষের পৃষ্ঠার পর : বজায় থাকে। এই পেঁয়াজের জীবনকাল ৭৫ থেকে ৮০ দিন।

কৃষি বিভাগের তথ্যানুযায়ী, জেলায় এবার ৮ হাজার ৯৩০ হেক্টর জমিতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে সদর উপজেলায় ১৭১৬, আটঘরিয়ায় ৩৬০, ঈশ্বরদী ৮১১, চাটমোহর ৪৪০, ভাঙ্গুড়া ৪০, ফরিদপুর ৩৫৫, বেড়া ২ হাজার, সাঁথিয়া ১৬১৩ ও সুজানগর উপজেলায় ১৫৮৫ হেক্টর জমিতে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। এসব উপজেলা থেকে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৯৩২ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে ধারণা পাওয়া গেছে, নতুন মৌসুমে মুড়িকাটা পেঁয়াজ আবাদ নিয়ে এ অঞ্চলের চাষীরা আবারো স্বপ্ন দেখছেন। যদিও তাঁদের মধ্যে সার সংকট, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে চিন্তিত। কৃষকদের ভাষ্য, গত বছরের তুলনায় বিঘাপ্রতি আবাদ খরচ বেড়েছে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা। উৎপাদন খরচ বাড়লেও মৌসুম শেষে পেঁয়াজের ন্যায্য দাম মিলবে কি না- তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাজ করছে। পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভাষ্য হলো, মুড়িকাটা পেঁয়াজ আবাদ হয় চারা বা হালি পেঁয়াজ আসার আগে বাজারের চাহিদা মেটাতে। গত কয়েক দফায় ভালো বাজার না পাওয়ায় অনেক কৃষক এবার মুড়িকাটার আবাদ কমিয়েছে। ওয়াকেবহাল সূত্র মতে, মুড়িকাটা পেঁয়াজ চাষ বেশ ব্যয়বহুল হলেও সঠিক বাজারমূল্য পেলে এটি অত্যন্ত লাভজনক একটি ফসল। বীজ (কন্দ), সার, সেচ, কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ আবাদে ৭০,০০০ থেকে ৯০,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হচ্ছে, যা আগে ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা ছিল। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে প্রতি বিঘায় গড়ে ৭০ থেকে ৮০ মণ পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়। বাজারজাতকরণের শুরুতে (ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে) সাধারণত বাজারে পুরনো পেঁয়াজের ঘাটতি থাকে। ফলে নতুন মুড়িকাটা পেঁয়াজ ভালো দামে বিক্রি করা যায়। কৃষকদের খরচ তুলে লাভ করতে হলে প্রতি মণ পেঁয়াজ নূন্যতম ২,৫০০ টাকা দরে বিক্রি করতে হয়। যদি বাজারে মণপ্রতি দাম ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা পাওয়া যায়, তবে প্রতি বিঘায় ২,১০,০০০ থেকে ২,৮০,০০০ টাকার পেঁয়াজ বিক্রি করা সম্ভব। সব খরচ বাদ দিয়ে তখন বিঘাপ্রতি ১,২০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত নিট লাভ করা সম্ভব হয়।

এবার 'উষ্ণ শীতে'র

প্রথম পৃষ্ঠার পর : গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এবারের শীত হবে 'ওয়ার্ম উইন্টার' বা উষ্ণ শীত। এলনিনোর প্রভাবে পৃথিবীজুড়ে উষ্ণতা বেড়েছে। পাশাপাশি রয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। বিভিন্ন কারণে এবারের শীত উষ্ণ হতে পারে বলে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থাও জানিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এবারের শীতে শীতের অনুভূতি যেমন কম হবে, তেমনি শীতকালের ব্যাপ্তিও কমবে। দেশে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল ধরা হয়। তবে এবার শীতের স্থায়িত্ব ৯০ দিনের কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসের পরিবর্তন এবং সূর্যকিরণ তির্যকভাবে আসার কারণে চলতি নভেম্বরের প্রথম দিকে উত্তরের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসতে পারে। মাসের শেষ দিকে উত্তরাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে শৈত্যপ্রবাহও হতে পারে। ঢাকায় শীত আসবে ডিসেম্বরে। ওই সময় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে। শৈত্যপ্রবাহও হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, বৃষ্টির সঙ্গে শীতের সম্পর্ক নেই। শীতকালে বাতাসের ধরনে পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টি হয়। ভূমধ্যসাগর থেকে আসা বাতাস দেশে প্রবেশ করলে বৃষ্টি হয়। ওই বাতাস মেঘ নিয়ে আসে। তিনি জানান, এখন হিম হিম ভাবের কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিদায় নিয়েছে। বর্তমানে বাতাস আসছে উত্তর দিক থেকে। আগামী কয়েক মাসে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে। যত বেশি উত্তরের বাতাস আসবে, তত বেশি ঠান্ডা অনুভূত হবে। এখন যেমন উত্তর দিক থেকে বাতাস আসছে, ফলে উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে এসেছে।

আশার আলো বিদ্যুতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : প্যানেল বা রুফটপ সোলার স্থাপন; ভারত নেপাল ও ভুটানসহ আঞ্চলিক উৎস থেকে বিদ্যুৎ আমদানির মাধ্যমে গ্রিডের ওপর চাপ কমানো; কৃষিসেচে ডিজেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সোলার ইরিগেশন বা সৌরশক্তিভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা বাড়ানো; বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং বিতরণ ব্যবস্থার দুর্নীতি ও অপচয় রোধে মনিটরিং জোরদার; উদ্যোক্তা তৈরি করতে প্রতি ইউনিট সাড়ে ১০ টাকায় বিদ্যুৎ কেনা (এতে করে নেট মিটারিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন খাত থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিক্রির প্রস্তাব আসতে পারে); তিন বছরের মধ্যে পায়রা, বড়পুকুরিয়া ও মাতারবাড়ীতে কমপক্ষে তিনটি কয়লাভিত্তিক কেন্দ্র বসিয়ে ২ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা; বিদ্যুতকেন্দ্রগুলো চালাতে- অর্থাৎ তেল, গ্যাস ও কয়লার সরবরাহ বাড়াতে ১৫০টি নতুন গ্যাস কূপ খনন, ভোলাসহ উপকূলীয় ও স্থলভাগে আবিষ্কৃত গ্যাস দ্রুত জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা। আশা করা হচ্ছে, এই পদক্ষেপগুলো দ্রুত কার্যকর করা সম্ভব হলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চলমান সংকট কেটে যাবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ
৮
শনিবার
১৪ নভেম্বর ২০২৬
২৯ কার্তিক ১৪৩৩
৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৮

কপালী কাটার তালিকায় ৫২ হাজার খেজুর গাছ

চলছে রস সংগ্রহের প্রস্তুতি

মোসতাফা সতেজ

পাবনা সদরসহ সব উপজেলায় রস আহরণের আশায় খেজুর গাছের কপালী কাটা শুরু হয়েছে। ৩ শতাধিক গাছি ও শিউলি তাদের পরিকল্পনা মতো রস সংগ্রহ শুরু করেছেন। এই গাছ থেকে শিউলিরা সংগ্রহ করবেন সুমিষ্ট রস, তৈরি হবে লোভনীয় গুড় ও পাটালি।

পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, জেলায় ৫২ হাজারেরও বেশি খেজুর গাছ আছে। এর মধ্যে ঈশ্বরদীতে ১৬ হাজার, সাঁথিয়ায় ৭ হাজার, পাবনা সদর ও বেড়া উপজেলা সাড়ে ৬ হাজার করে, চাটমোহর ও ফরিদপুরে ২ হাজার করে, আটঘরিয়া, সুজানগর ও ভাঙ্গুড়া প্রায় ৪ হাজার করে গাছ আছে। গড়ে ২০-২৫টি গাছের সঙ্গে গড়ে ২ জন করে (গাছি ও শিউলি) কাজ করেন। সে হিসাবে ৩শ লোকবল এ মৌসুমে ব্যস্ত থাকছেন। এই রস ও রস থেকে গুড়ের তৈরি নানান রকম পিঠা ও পায়েস খাওয়ার ধুম পড়বে এই শীত মৌসুমে। ভোক্তারা জানান, খেজুরের নলেন গুড়ের স্বাদ ও ঘ্রাণ ভীষণ লোভনীয়। রসনা তৃপ্তিতে খেজুর গুড় ও পাটালির জুড়ি নেই।



খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এরইমধ্যে ব্যাপারীরা গ্রামের শিউলিদের সঙ্গে খাঁটি রস ও গুড়ের জন্য যোগাযোগ শুরু করেছেন। আবার কেউ কেউ শিউলিদের নিকট অগ্রিম টাকা তুলে দিচ্ছেন ভাল রস, গুড় ও পাটালি পাওয়ার আশায়। অগ্রিম টাকা পেয়ে অনেক শিউলি কিনছেন রস সংগ্রহের উপকরণ। পাবনার বাইরে থেকেও শিউলি (রস সংগ্রহকারী) ও গাছিরা (যারা গাছের কপালী কাটে) আসছেন।

চাটমোহর উপজেলায় এখন পর্যন্ত শীতের আগমন সেভাবে না ঘটলেও গাছিরা খেজুর গাছের ডাল পরিষ্কার, দা তৈরি, গাছে ওঠার দড়ি, মাটির ভাড় ও রস জ্বালানোর তাওয়া কেনা, চুলা তৈরিসহ যাবতীয় কাজ পুরোদমে করছেন। আর মাত্র সপ্তাহখানেক পর থেকেই গ্রামবাংলার গৌরব আর ঐতিহ্যের প্রতীক খেজুর গাছকে ঘিরে পল্লী এলাকায় শুরু হবে উৎসব মুখর পরিবেশ।

জানা গেছে, এ বছর গাছিরা একটু আগেভাগেই খেজুর গাছের কপালী কাটতে শুরু করেছেন। তবে এরইমধ্যে হাট-বাজারে পাটালী গুড় পাওয়া যাচ্ছে। চাটমোহরের মূলগ্রামের গাছি আ. কাদের জানান, এবার তিনি ৫০টিরও বেশি গাছে রস সংগ্রহ করবেন। গাছের মালিকদের গুড় দিয়ে চুক্তি করা হচ্ছে।

আরেক গাছি আ. সাত্তার এবার ৩০টি গাছে রস সংগ্রহ করবেন। ইতিহাস থেকে জানা গেছে, এক সময় এ জেলার খেজুরের রস, গুড় ও পাটালি উৎপাদনে প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল তো বটেই, দেশের বাইরেও এর কদর রয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

স্থানীয় পদ্ধতিতে সাড়া



খাঁচায় মাছের চাষ

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ফরিদপুরে (পাবনা) গুমানী নদীর নরায়ণপুর পয়েন্ট। পানিতে ভাসছে সারি সারি খাঁচা। এর ভেতরই চাষ হচ্ছে পছন্দের মাছ। স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন খুব সহজে খাঁচার ভেতর লালন-পালন করা সম্ভব হচ্ছে মাছের ঝাঁক, আরেকদিকে মাছেরাও পাচ্ছে নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ। তেমন কোন কৃত্তিমতা ছাড়াই এভাবে ছোট থেকে বেড়ে উঠছে নানান জাতের মাছ।

মাছ পালনকারীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া গুমানি নদীর নারায়ণপুর পয়েন্টের দুই পাশে সারি সারি ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৩০০ খাঁচায় মাছের চাষ হচ্ছে। একই নদীর পার্শ্ববর্তী রতনপুর গ্রামেও রয়েছে আরও ১০টি খাঁচা। এরকম ভাসমান খাঁচায় পোনা ছাড়ার পর মাছ বাজারজাত করতে সময় লাগে ৪-৫ মাস। বাঁশ, জাল ও ভাসমান ড্রাম ব্যবহার করে এসব খাঁচা তৈরি করা হয়। ২০/১০ ফুট আয়তনের এক-একটি খাঁচা তৈরিতে খরচ হয় ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। বাজারদর ও উৎপাদন ব্যয় অনুকূলে থাকলে একটি খাঁচা থেকে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ হতে পারে। তারা জানান, এখানে মূলত মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের চাষ হচ্ছে। অন্য প্রজাতির মাছের চেয়ে এই মাছে বেশি লাভ হচ্ছে। তাঁদের কাছ থেকে আরও জানা গেছে, পুকুরের তুলনায় নদীতে এভাবে ১০০ গুণ বেশি ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়। ২০ ফুট বাই ১০ ফুটের একটি খাঁচা থেকে ১০ থেকে ১৫ মণ মাছ উৎপাদন সম্ভব।

সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, এভাবে মাছ চাষের ব্যাপারে সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে এ খাত মাছ উৎপাদনে নতুন অধ্যায় রচনা করতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কিছু নিশ্চিত না হওয়ায় সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বৃহৎ পরিসরে এ চাষ সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না।



অবশেষে ঢাকা যাচ্ছে ট্রেন

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দীর্ঘ অপেক্ষা এবং নানা জটিলতার পর অবশেষে ঢাকা-পাবনা সরাসরি আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু হতে যাচ্ছে। আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে এ রুটে 'পাবনা প্রভাতী এক্সপ্রেস' ও 'পাবনা গোধূলি এক্সপ্রেস' নামে এক জোড়া ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ৮০৮ নম্বর পাবনা প্রভাতী এক্সপ্রেস সকাল ৮টায় পাবনা থেকে ছেড়ে দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ৮০৭ নম্বর পাবনা গোধূলি এক্সপ্রেস বিকেল ৩টা ২৫ মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে রাত ৯টা ২০ মিনিটে পাবনায় পৌঁছাবে। দুই দিকেই যাত্রার সময় হবে প্রায় ছয় ঘণ্টা। উভয় ট্রেনের যাত্রাবিরতির তালিকায় রয়েছে দাশুরিয়া, ঈশ্বরদী,

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সংশোধনী

সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর গত মুদ্রিত সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় প্রধান শিরোনাম এবং প্রতিবেদনের শুরুতে '১৯৮ বছরে পাবনা'-এর স্থলে '২০০' বছর লেখা হয়েছে। অসাবধানবশত এ ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।-স/প

ঘাটতি মোকাবিলায় মাইলফলক

মুড়িকাটা পেঁয়াজের আবাদ

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ঘাটতি মোকাবেলায় বাজারে আসছে পাবনা অঞ্চলের বহুল আলোচিত মুড়িকাট পেঁয়াজ। এরইমধ্যে গ্রামীণ আবাদীরা এর পেছনে ব্যস্ত সময় দিচ্ছেন। আগামী মাস থেকেই এ পেঁয়াজ বাজারে আসা শুরু করবে।

আবাদীদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, মুড়িকাটা পেঁয়াজ মূলত একটি আগাম জাতের ফসল, যা দেশের পেঁয়াজের ঘাটতি মেটাতে বড় ভূমিকা রাখে। প্রতি বছর অক্টোবর থেকে নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) মাসের মধ্যে পাবনার সুজানগর, চাটমোহর ও সদর উপজেলার উঁচু জমিগুলো থেকে পানি নেমে গেলে এই পেঁয়াজ রোপণ করা হয়। রোপণের পর মাত্র আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে, অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই পেঁয়াজ পুরোপুরি তোলার উপযোগী বা উৎপাদিত হয়ে যায়। ফলে ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই এই নতুন পেঁয়াজ পাবনার স্থানীয় হাট-বাজারসহ সারা দেশের বাজারে আসতে শুরু করে। জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত এর সরবরাহ পুরোদমে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩





প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। সম্পাদনা পর্ষদ : **আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : www.sompritibangladesh.com ব্লাগ লিঙ্ক : https://sompritibangladesh.blogspot.com/ ইউটিউব লিঙ্ক : https://www.youtube.com/@sompritibd
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।